# প্রথম আলো বিজয় দিবস সংখ্যা ২০১৪

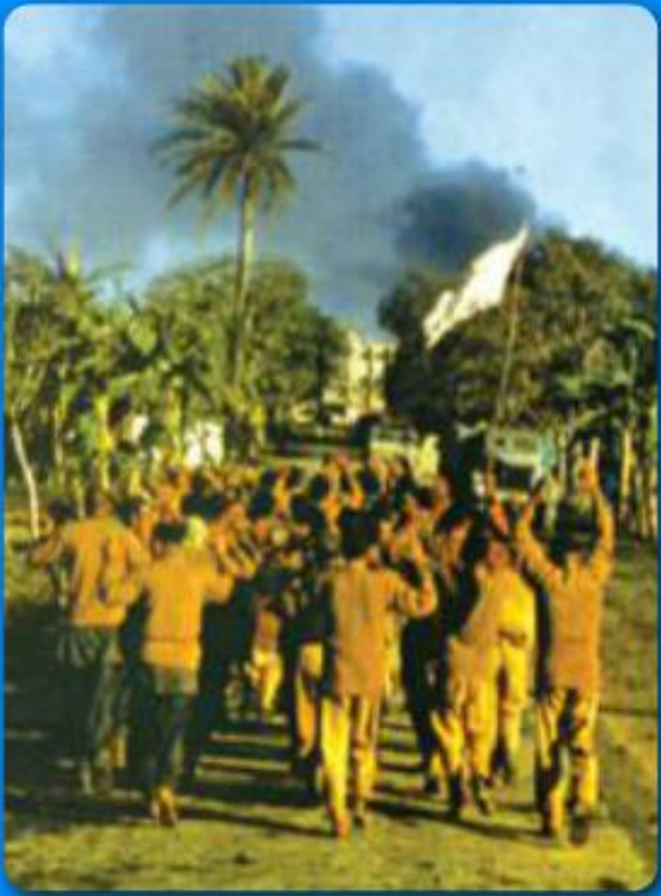

# বিজয়ের যুদ্ধের দিকে

একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে শত্রুপক্ষ ও মিত্রপক্ষ ছিল। ঠান্ডাযুদ্ধের তীব্র টানাপোড়েনের সেই যুগে যার যার স্বার্থ নিয়ে ছিল আরও বহু পক্ষ। এসবের মধ্যেই বিচিত্র স্তরে নানা মানুষের মিলিত চেষ্টায় ও আত্মত্যাগে, কারও সাফল্যে এবং কারও পরাজয়ের মধ্য দিয়ে আসে বিজয়। জন্ম হয় রক্তমাখা বাংলাদেশের। এই বিজয় দিবসে যার যার পটভূমি থেকে এখানে পরিবেশিত হলো মুক্তিযুদ্ধের শেষ পর্যায়ের চোখে দেখা ঘটনা

পাকিস্তান কূটনৈতিক সার্ভিসে যোগ দিয়েছিলাম ১৯৬৬ সালে। দুই বছরের মাথায় ১৯৬৮ সালের আগস্টে ভাইস কনসাল হিসেবে যোগ দিই নিউইয়র্কে তৎকালীন পাকিস্তান কনস্যুলেটে। সেখানে শুরু থেকেই টেগোর সমিতিতে যোগদান এবং ছাত্রসহ বিভিন্ন শ্রেণির বাঙালিদের সঙ্গে সম্পৃক্ততার কারণে আমার ওপর ছিল সরকারের নজরদারি। এর মধ্যে ১৯৭১ সালে ২১ ফেব্রুয়ারি পালনে সরাসরি যুক্ত হয়ে খুব স্পষ্ট করেই বুঝিয়ে দিয়েছিলাম, আমি আর পাকিস্তানের সঙ্গে নেই। এর অনিবার্য পরিণতিতে ২৫ এপ্রিল ইসলামাবাদ ফিরে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয় আমাকে। ওই সিদ্ধান্তের পরদিন, অর্থাৎ ২৬ এপ্রিল প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করি। এরপর মুজিবনগর সরকার আমাকে যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশ সরকারের প্রতিনিধি হিসেবে নিয়োগ দেয়। নিউইয়র্কের ১০ পূর্ব ৩১ সড়কে চালু করি অস্থায়ী বাংলাদেশ মিশন। তবে আগস্ট মাসে আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশ মিশন খোলার আগ পর্যন্ত বাংলাদেশ লীগের সঙ্গে আমি ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলাম। এর আগে মে মাস থেকে বাংলাদেশের প্রতিনিধি হিসেবে জাতিসংঘের পাশাপাশি মার্কিন মহল ও গণমাধ্যমে স্বাধীনতার পক্ষে আমাদের অবস্থান তুলে ধরেছিলাম।

**এফ আর খানের অবদান**

বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের শুরু থেকেই এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন বাংলাদেশের প্রখ্যাত স্থপতি এফ আর খান। তিনি ছিলেন ইস্ট পাকিস্তান লিগ অব আমেরিকার সঙ্গে জড়িত। পরে বাঙালিদের নিয়ে শিকাগোতে বাংলাদেশ ডিফেন্স লিগ নামে আলাদা একটি সংগঠন করেন। মে মাসে বিচারপতি আবু সাইদ চৌধুরী নিউইয়র্ক গেলে তিনি তাঁর সঙ্গে দেখা করেন। মুক্তিযুদ্ধকালে অন্যান্য প্রস্তুতির পাশাপাশি যুক্তরাষ্ট্রে প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের দূতাবাস প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে তিনি বেশ উৎসাহী ছিলেন। আবু সাইদ চৌধুরী ও অর্থনীতিবিদ রেহমান সোবহানকে তিনি এ ব্যাপারে রাজি করাতে চেষ্টা করেন।

২৬ এপ্রিল আমি প্রবাসী সরকারের প্রতি আনুগত্য স্বীকার করলেও ওয়াশিংটনে কর্মরত অনেক বাঙালি কূটনীতিক তখনো পশ্চিম পাকিস্তানের প্রতিনিধিত্ব করছিলেন। এ নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন স্থানে কর্মরত বাঙালিদের মধ্যে অসন্তোষ ক্রমেই বাড়ছিল। শিকাগোতে ৬ জুন, ওয়াশিংটনে ১৮ জুন আর নিউইয়র্কে ২৬ জুনের কনভেনশনে এ নিয়ে বাঙালিরা তাঁদের ক্ষোভের কথা জানান।

নিউইয়র্কের কনভেনশনের পর এক আলোচনায় ওয়াশিংটনে পশ্চিম পাকিস্তান দূতাবাসে কর্মরত ইকোনমিক কাউন্সেলর আবুল মাল আবদুল মুহিতের সঙ্গে এফ আর খান কথা বললেন। তিনি জানতে চাইলেন, ওই মিশনে কর্মরত বাঙালিরা প্রবাসী সরকারের প্রতি কেন এখনো আনুগত্য প্রকাশ করছে? মিশন চালাতে কত টাকা দরকার? ওয়াশিংটন মিশনে একজন উপরাষ্ট্রদূতসহ কূটনৈতিক ও প্রেষণে নিয়োগ পাওয়া অন্তত ছয়জন বাঙালি জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা কাজ করছিলেন। আবুল মাল আবদুল মুহিত জানালেন, মিশন চালাতে সব মিলিয়ে মাসে ২০ হাজার ডলার প্রয়োজন। এফ আর খান মুহূর্তের মধ্যে চেকবই বের ২০ হাজার ডলারের একটি চেক লিখে দিলেন। দিয়ে বললেন, ‘টাকাটা নিয়ে যান। সবাইকে জানিয়ে দিন, বাংলাদেশ স্বাধীন না হওয়া পর্যন্ত মিশনের খরচ চালানোর দায়িত্ব আমার।’

**সেই স্ট্যাম্প সংখ্যা**

জুলাইয়ের শেষ সপ্তাহে মুজিবনগর সরকারের পররাষ্ট্র দপ্তরের ফোন পেলাম। লন্ডন ও মুজিবনগর থেকে একই সময়ে স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম স্মারক ডাকটিকিট প্রকাশিত হবে। যুক্তরাজ্যের পার্লামেন্ট হাউসে সাবেক পোস্টমাস্টার জেনারেল জন স্টোনহাউস ও বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকারের প্রধান বৈদেশিক প্রতিনিধি বিচারপতি আবু সাইদ চৌধুরী ডাকটিকিটগুলো উন্মোচন করবেন। আমার কাছে নির্দেশ এল, ডাকটিকিটগুলো যুক্তরাষ্ট্রে উন্মোচন করতে হবে।

দায়িত্বটি কীভাবে পালন করা যায়, তা নিয়ে ভাবলাম। আজ ভাবতে ভালো লাগে, কাজটি যেভাবে সম্পন্ন করা হয়, তাতে শুধু যুক্তরাষ্ট্রই নয়, ‘রেবেল স্ট্যাম্প’-এর মাধ্যমে বিশ্বের নানা প্রান্তের মানুষ জেনেছিল বাঙালির মুক্তিসংগ্রামের কথা। এ প্রসঙ্গে কৃতজ্ঞতা জানাতে হয় নিউইয়র্ক টাইমস ও তার জাতিসংঘ প্রতিনিধি ক্যাথলিন টেল্টশকে। কৃতজ্ঞতা জানাতে হয় শিডনি শনবার্গ ও ডেভিড লিডম্যানকেও।

আগস্ট ১৯৬৮ সালে পাকিস্তানের তৎকালীন কনস্যুলেটে ভাইস কনসাল হিসেবে কাজ শুরু করার পর নিউইয়র্ক টাইমস-এর এই জাতিসংঘ প্রতিনিধি ক্যাথলিন বা কিটির সঙ্গে আমার পরিচয়। এক সেট স্ট্যাম্প হাতে পাওয়ার পর সেগুলো নিয়ে আমি গেলাম কিটির কাছে। তাঁকে জানালাম, বাংলাদেশের প্রথম স্মারক ডাকটিকিট তাঁর ১০ বছরের ছেলের জন্য উপহার হিসেবে নিয়ে এসেছি। লন্ডনপ্রবাসী বিমান মল্লিকের নকশা করা ডাকটিকিটগুলো পেয়ে কিটি ভীষণ আপ্লুত হয়ে বললেন, ‘আমার ছেলের এগুলো খুব পছন্দ হবে। বলো, তোমার জন্য আমি কী করতে পারি?’ এবার আমি পুরো বিষয়টি তাঁকে খুলে বললাম।

কিটি আমাকে নিয়ে গেলেন নিউইয়র্ক টাইমস-এর রবিবাসরীয় সংখ্যার স্ট্যাম্প বিভাগের সম্পাদকের কাছে। ঠিক হলো, পত্রিকাটির দক্ষিণ এশিয়া প্রতিনিধি মুজিবনগর
গিয়ে মুক্তাঙ্গন থেকে ডাকটিকিট উন্মোচন অনুষ্ঠানের খবর সংগ্রহ করতে যাবেন।
লন্ডন প্রতিনিধি সংগ্রহ করবেন সেখানকার অনুষ্ঠানের খবর। সব শেষে স্ট্যাম্প বিভাগের সম্পাদক স্ট্যাম্প এবং সংক্রান্ত পুরো বিষয়টি পর্যালোচনা করবেন।

বাংলাদেশের প্রথম স্মারক ডাকটিকিট নিয়ে নিউইয়র্ক টাইমস-এর ৮ আগস্ট সংস্করণের স্ট্যাম্প বিভাগের পুরো পাতাজুড়ে ছাপা হয়েছিল ‘স্ট্যাম্পস: বাংলাদেশ: ট্রিড উইথ কশন’ শিরোনামে ডেভিড লিডম্যানের বিশেষ প্রতিবেদন। এভাবে মার্কিন জনগণের পাশাপাশি বিভিন্ন দেশের কাছে পৌঁছে যায় বাংলাদেশের খবর।

নিউইয়র্ক টাইমস-এর পাশাপাশি ২৭ জুলাই ওয়াশিংটনের দৈনিক ইভিনিং স্টার পত্রিকাটিও সবগুলো ডাকটিকিটের ছবি নিয়ে একটি প্রতিবেদন ছাপায়। মার্কিন সাময়িকী নিউজউইক-এর ৯ আগস্ট সংস্করণে ‘রেবেল স্ট্যাম্প’ শিরোনামে ছাপা হয় আরেকটি ফিচার।

**বুশের সঙ্গে সাক্ষাৎ**

নিউইয়র্ক থেকে শুরু করে যুক্তরাষ্ট্রের নানা প্রান্তের বাঙালিদের সঙ্গে যোগসূত্রটা হয়ে গিয়েছিল বেশ আগেই। নানা স্তরের মার্কিন জনগণের সমর্থনের পারদটা বেশ মাপা যাচ্ছিল। নিক্সন-কিসিঞ্জারের দুরভিসন্ধি বুঝে নেওয়ার পরও মার্কিন প্রশাসনের মনোভাব বুঝতে উচ্চ পর্যায়ে পৌঁছানোটা জরুরি ছিল। সে চেষ্টা চলছিল বেশ কয়েক মাস ধরে। কিন্তু কিছুতেই তা সম্ভব হচ্ছিল না। আমি তখন সাহায্য চাইলাম বন্ধু হোমার জ্যাকের। জাতিসংঘে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্থায়ী প্রতিনিধি ও রিপাবলিকান পার্টির নেতা জর্জ ডব্লিই বুশ সিনিয়রের সঙ্গে দেখা করার কথা তুললাম তাঁর কাছে। বুশের সঙ্গে দেখা করব প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের প্রধান বৈদেশিক প্রতিনিধি বিচারপতি আবু সাইদ চৌধুরীকে সঙ্গে নিয়ে। বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের বিষয়ে কথা বলাটা জরুরি।

হোমার জ্যাক উত্তর দিলেন, ‘এ তো রীতিমতো অসম্ভব!’
অসম্ভব বলেই তো তোমাকে বলা। আমি বললাম।
‘এ কী করে সম্ভব। তোমার বয়স কম তো। তাই এভাবে বলছ।’

৩০ পেরোনো আমাকে তাচ্ছিল্যভরা উত্তর দিলেন দ্বিগুণ বয়সী হোমার জ্যাক। মুক্তিযুদ্ধের সূচনালগ্ন থেকেই নিউইয়র্কের কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি বাংলাদেশের বিশেষ বন্ধু হিসেবে কাজ করেছেন। কাউন্সিল ফর পিস গ্রু রিলিজিয়নসের মহাসচিব হোমার জ্যাক ছিলেন তাঁদের একজন। আরও ছিলেন ইন্টারন্যাশনাল কাউন্সিল অব জুরিস্টসের সদস্য জন সলজবার্গ, ইউএন করেসপনডেন্টস অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি ড. জয়ন্ত ভট্টাচার্য প্রমুখ। হোমার জ্যাক আর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক অধ্যাপক জয়ন্ত ভট্টাচার্যর অফিস দুটো হয়ে উঠেছিল জাতিসংঘকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশের সব কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রবিন্দু।

যাহোক, হোমার জ্যাকের সঙ্গে সেই কথাবার্তার পর কয়েক মাস চলল। হঠাৎ নভেম্বরের শেষ সপ্তাহে এসে নাটকীয়ভাবে তিনি জানালেন, আবু সাইদ চৌধুরীর সঙ্গে বুশের সাক্ষাৎটা হলেও হতে পারে। তবে খুব সংক্ষিপ্ত, হতে পারে মাত্র এক ঘণ্টার নোটিশে সাক্ষাৎটা হবে।

শেষ পর্যন্ত কাউন্সিল ফর পিস গ্রু রিলিজিয়নসের মহাসচিব হোমার জ্যাকের উদ্যোগে ২৩ নভেম্বর বেলা ১১টায় জাতিসংঘে সিনিয়র বুশের দপ্তরে বৈঠকটি হয়েছিল।

চার দশক পর আজও জর্জ বুশের সঙ্গে সে দিনের ওই আলোচনার কথা মনে হলে অদ্ভুত বিস্ময় জাগে। সেদিন আলোচনা চলল মিনিট চল্লিশেক। পুরো আলোচনায় বুশ যথেষ্ট আন্তরিক ছিলেন। তিনি বললেন, মার্কিন জনগণ তো বাংলাদেশের স্বাধীনতার পক্ষে। মেডিসন স্কয়ারের কনসার্ট, গিনসবার্গের লেখা কবিতা ইত্যাদি প্রসঙ্গও তিনি নিজেই তুললেন। ততটা আমি নিজে আশা করিনি। আবু সাইদ চৌধুরীও নন।

মার্কিন হস্তক্ষেপের প্রসঙ্গ তুলতেই বুশ বললেন, ‘না, না, প্রশ্নই ওঠে না। যুক্তরাষ্ট্রের সাধারণ মানুষ তো বটেই, রিপাবলিকান পার্টির বহু সিনেটরও বাংলাদেশের পক্ষে। সেই এপ্রিল থেকে এ নিয়ে মার্কিন সিনেটে আলোচনা চলছে। ওসব আলোচনা পর্যবেক্ষণ করলেই দেখা যাবে তাঁদের সাধারণ সমর্থন বাংলাদেশেরই পক্ষেই। এটুকু বলতে পারি, বাংলাদেশ স্বাধীন হতে যাচ্ছে। দিনক্ষণ তো বলা সম্ভব নয়, তবে ডিসেম্বরের মাঝামাঝি সেটি ঘটতে চলেছে।’

বুশের সঙ্গে আমাদের আলোচনা সেদিন শেষ হয়েছিল এভাবেই। সে সময়ের তরুণ কূটনীতিক আমি এ আলোচনার পর আশাবাদী হয়ে উঠেছিলাম এই যে মুক্তিযুদ্ধের গতিপথ তাহলে বিজয়ের দিকেই এগোচ্ছে।

**এ এইচ মাহমুদ আলী: মুক্তিযুদ্ধকালে যুক্তরাষ্ট্রে প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের প্রতিনিধি ; বাংলাদেশ সরকারের বর্তমান পররাষ্ট্র মন্ত্রী**

# বিজয় অভিযান

ভারতীয় গার্ডস রেজিমেন্টের নেতৃত্বে ৩১১তম মাউন্টেন ব্রিগেড কলামটি নরসিংদী-ডেমরা-তারাব সড়ক ধরে ঢাকার দিকে রওনা হয়। আমার 'এস' ফোর্স ও ৩ নম্বর সেক্টরের বাহিনীসহ নরসিংদী-ভুলতা-মুড়াপাড়ার পথ ধরে রূপগঞ্জে শীতলক্ষ্যা পার হয়ে নদীর পশ্চিম পাড়ে অবস্থান নিই।

১৩ ডিসেম্বর রাতেই আমরা মুড়াপাড়ায় এবং সেই দিনই অগ্রবর্তী সেনাদল শীতলক্ষ্যা ও বালু নদ অতিক্রম করে ঢাকার পাঁচ-ছয় মাইলের মধ্যে পৌঁছে যায়।

আমার সেক্টরের সৈন্যরা বাসাবো এলাকায় শত্রুসৈন্যদের মুখোমুখি হয় এবং ১৪ ডিসেম্বর রাতে ভয়ংকর যুদ্ধ চলে। পাকিস্তানি বাহিনী বেপরোয়া হয়ে দৃঢ়তার সঙ্গে শেষ চেষ্টা চালিয়ে যায়। কিন্তু ওরা ঢাকা থেকে নতুন সংযোজন প্রেরিত হওয়া সত্ত্বেও দীর্ঘ সময় অবস্থান চালিয়ে যেতে ব্যর্থ হয়।

সম্মিলিত বাহিনীর দূরপাল্লার কামানগুলো ঢাকার ওপরে অবিরাম গোলাবর্ষণ করে চলেছে। অন্যদিকে লে. জেনারেল নিয়াজির যাবতীয় কামান রয়েছে বহুদূরে সীমান্ত এলাকায়। তাঁর কাছে যথেষ্ট সৈন্য রয়েছে। নেই শুধু আমাদের এগিয়ে চলার পথকে ক্ষতিগ্রস্ত করার উপযোগী দূরপাল্লার অস্ত্রশস্ত্র। আমাদের প্রতিহত করার প্রশ্ন তো এ ক্ষেত্রে একেবারেই অবান্তর।

আমি ভালো করেই উপলব্ধি করছি, জেনারেল নিয়াজি দূরপাল্লার অস্ত্রশস্ত্র না থাকার ফলে উদ্ভূত বর্তমান পরিস্থিতিতে কী ধরনের দুর্দশায় রয়েছেন। মুক্তিযুদ্ধের প্রাথমিক পর্যায়ে আমরা ঠিক একই ধরনের অবস্থার শিকার হয়েছিলাম। এই যে ভুল, এই ত্রুটি এবং এই যে অদূরদর্শিতা—এর জন্য জেনারেল নিয়াজি নিজেকে ছাড়া আর কাউকে তিনি দোষারোপ করতে কিংবা অপবাদ দিতে পারেন না। পারেন শুধু নিজেই নিজেকে ধিক্কার দিতে।

ধাবিত করার যেকোনো অপারেশন বা তৎপরতায়—বিশেষত, আমরা যে পরিস্থিতিতে রয়েছি—সর্বোচ্চ বিবেচনার বিষয় হচ্ছে সময় এবং ব্যাপ্তি-স্থান। ঢাকায় উপনীত হওয়ার দৌড় ঊর্ধ্বশ্বাসে, তথা তীব্রতম গতিতে—এমনকি বঙ্গোপসাগরের দিকে অজ্ঞাত উদ্দেশ্যে ছুটে আসা মার্কিন রণতরি 'এন্টারপ্রাইজ'-এর চেয়েও গতিসম্পন্ন করা সমীচীন ছিল। এ-ও হচ্ছে গতিবেগ-সম্পর্কিত রণকৌশল গৃহীত হওয়ার অন্যতম কারণ।

যখন ঢাকার চারদিকে পরিবেষ্টিত ফাঁস নজিরবিহীন গতিতে ঘড়ির কাঁটার মতো নিখুঁতভাবে সংকুচিত হয়ে আসছে, তখন ভারতীয় সেনাবাহিনীর প্রধান জেনারেল এস এ এম মানেকশ পাকিস্তান সেনাবাহিনীর পূর্বাঞ্চল কমান্ডের উদ্দেশে প্রচারিত এক রেডিও বার্তায় পাকিস্তানি বাহিনীর অবশ্যম্ভাবী আত্মসমর্পণের কথা পুনরায় ব্যক্ত করেন। এর ফলে পাকিস্তানি বহু কমান্ডার ও সৈন্যের মনে ব্যাপকভাবে ভীতির সঞ্চার হয়। একটি মাত্র ব্যতিক্রম পরিলক্ষিত হয় রাজধানী ঢাকায়, যেখানে লে. জেনারেল নিয়াজি অহমিকার সঙ্গে বললেন, 'আমার মৃতদেহের ওপরই কেবল ঢাকার পতন হতে পারে।' এ ঘোষণা পাকিস্তানিদের নিজেদের বাসভূমে প্রচারণা অভিযানের মূল্য বহন করে।

বাংলাদেশে পাকিস্তানি বাহিনীর দ্বিতীয় প্রভাবশালী ব্যক্তি হচ্ছেন মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলী। তিনি পাকিস্তানি সৈন্যদের নিরাপদ অপসারণের ব্যবস্থা করার জন্য জাতিসংঘের কাছে আবেদন জানান। কিন্তু জেনারেল ইয়াহিয়া খান তা বাতিল করে দেন। লে. জেনারেল নিয়াজি হচ্ছেন পাকিস্তানের রাজধানী ইসলামাবাদের সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষ বা প্রেসিডেন্টের প্রতিভূ মাত্র। তিনি শুধু জেনারেল ইয়াহিয়ারই প্রতিধ্বনি করেন। তাঁর আশপাশে কিংবা বাংলাদেশের সর্বত্র যা ঘটে চলেছে, সে সম্পর্কে তিনি নির্বিকার।

১৬ ডিসেম্বর সূর্য উদিত হয় দখলদার বাহিনীর আত্মসমর্পণের প্রসঙ্গ নিয়ে। ১৫ ডিসেম্বর, মিত্রবাহিনীর বোমাবর্ষণ সাময়িকভাবে বন্ধ করার জন্য লে. জেনারেল নিয়াজি স্বাক্ষরিত প্রস্তাবের সময়সীমা হচ্ছে ১৬ ডিসেম্বর, সকাল নয়টা পর্যন্ত। তদানুযায়ী একটি রেডিও-তরঙ্গ ব্যান্ড প্রতিষ্ঠা করা হয়। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে লে. জেনারেল নিয়াজিকে আত্মসমর্পণ করা বা না করা সম্পর্কে তাঁর সিদ্ধান্ত ওই ব্যান্ডের প্রচার করার শর্তারোপ করা হয়। অবরুদ্ধ পাকিস্তান পূর্বাঞ্চল কমান্ড চূড়ান্ত সময়সীমা আরও ছয় ঘণ্টা বাড়িয়ে দেওয়ার প্রস্তাব করলে জেনারেল মানেকশ তাঁর সম্মতি সকাল ১০টার সময় বেতারযোগে অবহিত করেন।

পরিস্থিতি দ্রুত মোড় নেয়। ভারতীয় সেনাবাহিনীর পূর্বাঞ্চল কমান্ডের প্রধান স্টাফ অফিসার মেজার জেনারেল জ্যাকব বেলা ঠিক একটার সময় আত্মসমর্পণের শর্তাবলিসম্পর্কিত দলিল নিয়ে হেলিকপ্টারে ঢাকায় পৌঁছান।

লে. জেনারেল নিয়াজি শর্তাবলিতে দুইটা ৪৫ মিনিটে অনুস্বাক্ষর করলে আত্মসমর্পণ দলিলে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাক্ষরের সময়সূচি নির্ধারিত হয় চারটা ৩০ মিনিট।

বেলা একটা ৪৫ মিনিটে ডেমরায় অবস্থানরত পাকিস্তানি সৈন্যরা আমার এস ফোর্সের কাছে আত্মসমর্পণ করে। বেলা

দুইটায় ডেল্টা সেক্টর কমান্ডার ব্রিগেডিয়ার সাবেগ সিং আমাকে জানান, মিত্রবাহিনীর ৫৭তম মাউন্টেন ডিভিশন থেকে তাঁর কাছে বার্তা এসেছে বেলা তিনটা ৩০ মিনিটে কুর্মিটোলা বিমানবন্দরে বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে সম্মিলিত বাহিনীর প্রধান লে. জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরাকে স্বাগত জানানোসহ আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার জন্য। ৩১১তম মাউন্টেন ব্রিগেডিয়ার কমান্ডার ব্রিগেডিয়ার মিস্রাও অনুরূপ সংবাদ আমাকে পৌঁছান। তাই মেজর মঈনকে দ্বিতীয় ইস্ট বেঙ্গল নিয়ে ঢাকার দিকে রওনা হওয়ার নির্দেশ দিয়ে আমি রওনা হই। ডেমরা-ঢাকা সড়ক তখনো নিরাপদ নয়। পরাজিত শত্রুবাহিনী ভীতসন্ত্রস্ত, নার্ভাস হয়ে, আবার কখনো প্রতিশোধপরায়ণ হয়ে, ট্রিগারের ওপরে আঙুল রেখে বসে আছে। তার সৈন্যদের মাঝ দিয়ে আমার সহযাত্রী হিসেবে বিমানবন্দরে পৌঁছে দেওয়ার জন্য আমি ডেমরা এলাকার পাকিস্তানি ১২ এফ এফ ব্যাটালিয়ন কমান্ডার লে. কর্নেল খিলজীকে সঙ্গে নিলাম। প্রায় আড়াইটায় লে. কর্নেল খিলজীর গাড়িতে করে পাকিস্তানি সৈন্যদের মধ্য দিয়ে রওনা হই৷ মাতুয়াইল কোনাপাড়া এলাকা থেকে পাকিস্তানি সৈন্যদের গুলিতে বাধাপ্রাপ্ত হই। লে. কর্নেল খিলজীর সহায়তায় সেই বাধা অতিক্রম করে বেলা তিনটা ৩০ মিনিটে বিমানবন্দরে পৌঁছাই। ঢাকা বিমানবন্দর যুদ্ধবিধ্বস্ত মাঠের আকার ধারণ করেছে। তবু বিজয় দিবসে এর মধ্যে স্বাগতসূচক মৃদু হাসির ঝলক যেন ফুটে উঠেছে।

সম্মিলিত বাহিনীর প্রধান লে. জেনারেল অরোরাকে যাঁরা সাদর সম্ভাষণ জানাতে এসেছেন, তাঁদের মধ্যে লে. জেনারেল নিয়াজি হচ্ছেন সব দৃষ্টির কেন্দ্র। বিষণ্ণ ও অবদমিত তাঁর মুখাবয়ব। পরাজিত একজন সেনাপতিকে প্রত্যক্ষ করার মতো এ হচ্ছে এক অভিজ্ঞতা—এমন এক বিচিত্র অভিজ্ঞতা—যিনি যুদ্ধক্ষেত্রেই শুধু পরাজয়ের গ্লানি স্বীকার করেননি, যাঁর রয়েছে আরও এক লজ্জাকর গণহত্যার সদ্য অতীত ইতিহাসও।

তাঁর পরাজয় শুধু পরাজয়ই নয়—পরাজয়েও একধরনের দীপ্তি আছে—লে. জেনারেল নিয়াজির তাও ছিল না। আমি যখন তাঁর দিকে ঘৃণার দৃষ্টি নিক্ষেপ করি, তখন তাঁর পুরো অস্তিত্ব অবিন্যস্ত এবং সম্পূর্ণ কালিমালিপ্ত আকারে আমার দৃষ্টিতে
ভেসে ওঠে।

আমাদের তেমন অপেক্ষা করতে হলো না। আকাশে দেখা গেল একটি হেলিকপ্টারবহর। টারমাকে অবতরণ করলেন সদলবলে জেনারেল অরোরা। তাঁর দলে রয়েছেন বাংলাদেশি বাহিনীর ডেপুটি চিফ অব স্টাফ (অপারেশন) গ্রুপ ক্যাপ্টেন আবদুল করিম খোন্দকার। বিমানবন্দরের অনুষ্ঠানপর্ব শেষে আমরা রমনা রেসকোর্সের উদ্দেশে রওনা হলাম (বর্তমানে সোহরাওয়ার্দী উদ্যান)। সেখানে পৌছে দেখি, বর্তমান পুলিশ নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রের পূর্ব পাশের বটগাছের নিচে একটি টেবিল ও দুইটি চেয়ার পাতা আছে৷

রেসকোর্সে সমবেত বিশাল জনতার জয়ধ্বনি-জয় বাংলা-ধ্বনির মধ্যে আত্মসমর্পণ দলিলে সই করেন আমির আবদুল্লাহ খান নিয়াজি, লে. জেনারেল, মার্শাল ল প্রশাসক, জোন বি এবং কমান্ডার, ইস্টার্ন কমান্ড (পাকিস্তান) এবং জগজিৎ সিং অরোরা, লে. জেনারেল. অফিসার কমান্ডিং ইন চিফ, ইন্ডিয়ান অ্যান্ড বাংলাদেশ ফোর্সেস ইন দি ইস্টার্ন থিয়েটার। তারিখ, ১৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১। এ হচ্ছে উৎসবের দিন। এ হচ্ছে আনন্দের দিন। এ হচ্ছে বিধাতার উদ্দেশে শুকরিয়া জ্ঞাপনের দিন। এ হচ্ছে এক সমুদ্র রক্ত থেকে উত্থিত বাংলাদেশের বিজয় দিবস। আত্মসমর্পণ দলিলে সই করার অনুষ্ঠানপর্ব চলাকালে ঐতিহাসিক দৃশ্য তাকিয়ে দেখলাম। এ হচ্ছে সহসা আয়োজিত এক অনাড়ম্বর অনুষ্ঠান। আমার সহযোদ্ধা সৈনিকদের নিয়ে যেদিন মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করি, সেদিন থেকে নয় মাস সমরে, শিবিরে, রণাঙ্গনে প্রতিমুহূর্তে উত্তেজনা, উৎকণ্ঠা, আনন্দ-বেদনা, আশা-নিরাশা, মৃত্যুভয় এবং সহযাত্রী বহু সৈনিকের মাতৃভূমির জন্য অকাতরে জীবন দেওয়ার করুণ দৃশ্যজনিত ভয়াল মুহূর্তে ছিলাম। কখনো এতটুকু বিশ্রাম গ্রহণ করিনি—নিদ্রাহীনতা, ক্ষুধা, ক্লান্তির কাছে মাথা নত করিনি—মনে হচ্ছে, জাতির নিশাবসান শেষে আজ আমি ধন্য হলাম—সদ্য স্বাধীন হওয়ার লগ্নে উপস্থিত হতে পেরে, বাংলাদেশ সরকারের প্রতিনিধিত্ব করার বিরল সম্মান পেয়ে অভিভূত হলাম।

**মেজর জেনারেল কে এম সফিউল্লাহ বীর উত্তম: মুক্তিযুদ্ধকালে এস ফোর্সের অধিনায়ক; সাবেক সেনাপ্রধান**

# পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সরাসরি যুদ্ধ

৩ ডিসেম্বর ১৯৭১। বিকেলবেলায় আমি কলকাতার ফোর্ট উইলিয়ামে আমার দপ্তরে কাজ করছি। সন্ধ্যা ছয়টায় টেলিফোন বেজে উঠল। ফোন করেছেন তৎকালীন সেনাপ্রধান জেনারেল (পরে ফিল্ড মার্শাল) স্যাম মানেকশ। দিল্লি থেকে ফোন করেছিলেন তিনি। তিনি জানালেন, পাকিস্তান পশ্চিমে আমাদের বেশ কয়েকটি বিমান ঘাঁটিতে বোমাবর্ষণ করেছে। তিনি আমাকে পূর্ব পাকিস্তানে অভিযান বাস্তবায়নের নির্দেশ দিলেন। 'পাকিস্তানের সঙ্গে আমাদের যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে,' তিনি বললেন। প্রধানমন্ত্রী তখন কলকাতায়। বিষয়টি তাঁকে অবহিত করতে তিনি আমাকে নির্দেশ দিলেন।

আমি আমার চিফ অব স্টাফ মেজর জেনারেল জ্যাকবকে (পরে লে. জেনারেল) ডেকে সব ফিল্ড কমান্ডারকে সতর্ক করে দিতে এবং একটি স্টাফ কনফারেন্স আয়োজন করতে বললাম। বললাম, 'মেস থেকে সবচেয়ে ভালো ব্র্যান্ডের স্কচ নিয়ে আসুন। আমি এক্ষুনি আসছি।'

গাড়ি চালিয়ে আমি রাজভবনে গেলাম। প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী সেখানে অবস্থান করছেন। আমি যখন পৌঁছালাম তখন তিনি সবেমাত্র একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে বক্তৃতা দিয়ে নিজের কামরায় ফিরেছেন। আমি দরজায় কড়া নাড়লে তিনি আমাকে ভেতরে ঢুকতে বলেন। আমি তাঁকে স্যালুট দিয়ে সেনাপ্রধানের বার্তা পৌঁছে দিলাম।

'হ্যাঁ,' তিনি উত্তর দিলেন। 'অল ইন্ডিয়া রেডিওতে আমি সেটা শুনেছি। এখন আমি দিল্লি যাচ্ছি।' তিনি দৃষ্টি ফিরিয়ে নিলেন। মনে হলো, তিনি কোথাও হারিয়ে গেছেন। তাঁর দৃষ্টি অনেক দূরে নিবদ্ধ।

নীরবতা ভেঙে আমি বললাম, 'শুভ কামনা, মিসেস গান্ধী।'

তিনি ফিরে দাঁড়িয়ে হাসলেন। আমার সঙ্গে হাত মিলিয়ে বললেন, 'আপনার জন্যও শুভ কামনা, জেনারেল।'

পাকিস্তানের সঙ্গে আমরা যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছি। প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলে ফোর্ট উইলিয়ামে আমার কার্যালয়ে চলে এলাম। আমার চিফ অব স্টাফ জেনারেল জ্যাকব মেস থেকে একটি ব্ল্যাক ডগ নিয়ে এলেন। স্টাফ অফিসার ও উপদেষ্টা যাঁরা ছিলেন, তাঁদের সবাইকে টেবিলে হুইস্কি পরিবেশন করা হলো। আমরা গ্লাস তুলে বাংলাদেশের আসন্ন বিজয় উদ্‌যাপন করলাম। আমাদের সবচেয়ে সুবিধাজনক সময়ে যুদ্ধ শুরু করায় ইয়াহিয়া খানের উদ্দেশেও আমি এক দফা পান করার প্রস্তাব করি। এরপর আমাদের কাজ শুরু হয়ে গেল।

আমার প্রথম কাজ ছিল আমার নেতৃত্বাধীন সেনাদের যুদ্ধপরিস্থিতি সম্পর্কে জানানো। তাঁদের নিজ নিজ দায়িত্ব পালনের জন্য নির্দেশ দেওয়া। একটি বিশেষ আদেশ জারি করে সে দিন আমি কাজটা সম্পন্ন করি। আদেশটা ছিল এ রকম:

পূর্বাঞ্চলীয় সেনাবাহিনীর সাহসী কর্মকর্তা ও জওয়ানেরা,

পাকিস্তান বিনা উসকানিতে আজ সন্ধ্যায় পশ্চিমে আমাদের বিমান ঘাঁটিতে আক্রমণ চালিয়েছে। আমরা পাকিস্তানের

সঙ্গে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছি। পূর্বাঞ্চলীয় সেনাবাহিনীর হাতে ভারতের ভৌগোলিক অখণ্ডতা রক্ষা এবং পশ্চিম পাকিস্তানের জোয়াল থেকে বাংলাদেশ স্বাধীন করার মহান দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে। এই দায়িত্ব অর্পিত হওয়ায় আমরা বিশেষ সম্মানিত বোধ করছি।

পাকিস্তান রাষ্ট্র জন্ম থেকেই ভারতের প্রতি ঘৃণা পোষণ করে আসছে। তারা ভারতকে ধ্বংস করতে চায়। পাকিস্তানি সেনাবাহিনী বাংলাদেশের জনগণের ওপর যে বর্বর ও অমানবিক নৃশংসতা চালিয়েছে, ইতিহাসে তার তুলনা পাওয়া ভার। বাংলাদেশে অসহায় মানুষকে আশ্রয় দেওয়ায় পাকিস্তান আমাদের ওপর আরও বিক্ষুব্ধ হয়েছে।

এখন সময় এসেছে, পাকিস্তানকে জুতসই শিক্ষা দেওয়ার। এবার চূড়ান্তভাবে তাদের শেষ করে দিতে হবে। ঈশ্বরের ওপর আস্থা রেখে এবং আমাদের উদ্দেশ্যের নীতিগত ব্যাপারে একাত্ম হয়ে আমি বলতে চাই, আপনারা সবাই গভীর আত্মনিবেদন, প্রতিজ্ঞা, পেশাদারি দক্ষতা ও উৎসর্গের মাধ্যমে নিজের নিজের দায়িত্ব পালন করতে ঝাঁপিয়ে পড়বেন। আমাদের পূর্ণ সফলতা লাভ করতে হবে সবচেয়ে কম সময়ের মধ্যে।

মনে রাখবেন, বাংলাদেশে আপনারা প্রবেশ করছেন মুক্তিদাতা হিসেবে, দখলদার হিসেবে নয়। জনগণের সঙ্গে আপনাদের আচরণ অবশ্যই বিবেকসম্মত ও যথাযথ হতে হবে।

আপনাদের সর্বাঙ্গীণ সাফল্য কামনা করছি। আপনারা দ্রুততম সময়ের মধ্যে সফল হোন।

২.

বাসায় ফিরে আমি আমার পড়ার ঘরে শুয়ে পড়লাম। সেখানে বাংলাদেশের একটা বড় মানচিত্র আর টেলিফোন। ভোর পর্যন্ত বেশ গভীর ঘুম হলো। ফিল্ড কমান্ডাররা কী করলেন, পর দিন সকাল সকাল তার খোঁজখবর নিলাম। দ্রুত নাশতা সেরে চলে গেলাম ফোর্ট উইলিয়ামে, স্টাফ কনফারেন্সে যোগ দিতে। প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দেওয়ার পর সংবাদ সম্মেলনের জন্য গেলাম প্রধান প্রেস কর্মকর্তার কার্যালয়ে। সেখানে দুই শরও বেশি ভারতীয় ও বিদেশি সাংবাদিক উপস্থিত। তাঁদের অনুরোধে আমি ব্যাখ্যা করে বোঝালাম, ভারতের ওপর কীভাবে এ যুদ্ধ চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। আর আমরাই বা কেন বাংলাদেশের মানুষের স্বাধীনতার যুদ্ধে সহায়তা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।

তাঁদের বললাম, আমাদের প্রধান লক্ষ্য হলো, বাংলাদেশে দখলদার পাকিস্তানি সেনাবাহিনীকে যতটা দ্রুত সম্ভব আত্মসমর্পণে রাজি করানো। আমি সবদিক থেকে নানা রকমের চাপ দিতে শুরু করেছি। তবে কাজটা আমি কীভাবে করব, সে সম্পর্কে তাঁদের কিছু বলতে পারিনি। মুক্তিবাহিনীর ভূমিকা সম্পর্কেও আমি কিছু বলতে অপারগতা জানাই। অনুমোদিত যুদ্ধ সংবাদদাতাদের আমি আমাদের অগ্রসরমাণ সেনাদের সঙ্গে যাওয়ার অনুমতি দিই।

যুদ্ধের প্রথম দিনের বেশির ভাগ সময়ই আমি অপারেশন কক্ষে বসে ফিল্ড কমান্ডারদের কাজের অগ্রগতির প্রতিবেদন দেখে কাটিয়ে দিয়েছিলাম।

*খুশবন্ত সিংয়ের বই ওয়ার অ্যান্ড পিস ইন ইন্ডিয়া, পাকিস্তান অ্যান্ড বাংলাদেশ-এ সংকলিত জেনারেল অরোরার বর্ণনা থেকে প্রতীক বর্ধনের অনুবাদ*

**লেফটেন্যান্ট জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরা: ১৯৭১ সালে ভারতের পূর্বাঞ্চলীয় সেনাবাহিনীর অধিনায়ক**

# জড়িয়ে পড়ল ভারত সরকার

যুদ্ধ শুরুর সম্ভাবনা ও মুক্তিসংগ্রামে আরও সহায়তা দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা আঁচ করতে পেরে ভারতীয় সেনাবাহিনীকে সতর্ক অবস্থায় রাখা হয়। সোভিয়েত ইউনিয়নকেও অস্ত্র সরবরাহের অনুরোধ করা হয়। তারা সঙ্গে সঙ্গে সেই অনুরোধে সাড়া দেয়। মধ্য অক্টোবরের মধ্যে ভারতে সোভিয়েত সামরিক সহায়তা আসতে শুরু করে। বয়রার যুদ্ধের পরই ভারত বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধে আইনি ও প্রক্রিয়াগত সহায়তার সব বন্দোবস্ত করে ফেলে (বয়রা যশোর সীমান্তবর্তী শহর, ১৯৭১ সালের নভেম্বর মাসে সেখানে পাকিস্তান বাহিনীর সঙ্গে মিত্র বাহিনীর যুদ্ধ হয়)। দিল্লি থেকে সামরিক ও বেসামরিক কর্মকর্তাদের একটি অগ্রগামী দল কলকাতায় যায়। আমার যত দূর মনে পড়ে, সময়টা ছিল নভেম্বরের ২৮ থেকে ৩০ তারিখের মধ্যে। যৌথ কমান্ড গঠনের লক্ষ্যে ভারত ও মুজিবনগর সরকারের মধ্যে একটি খসড়া মতৈক্য প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে তারা সেখানে যায়। এ সিদ্ধান্তও হয় যে কমান্ড গঠনের পর অভিযান শুরু হলে ইন্দিরা গান্ধী বাংলাদেশকে আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি দেবেন। ডিসেম্বরের ১ থেকে ৩ তারিখ পর্যন্ত মিসেস গান্ধী কংগ্রেসদলীয় কিছু সংযোগ এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে যোগ দিতে কলকাতায় অবস্থান করেন। বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধে ভারতের অংশগ্রহণের আনুষ্ঠানিকতা বিষয়ে মুজিবনগর সরকারের রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে তাঁর দেখা করার কথা ছিল।

মুক্তিযুদ্ধে সমর্থন দেওয়া এবং পরে তাতে অংশ নেওয়ার ব্যাপারে সাধারণ মতৈক্য থাকলেও নভেম্বরের শেষের দিকে যৌথ কমান্ড গঠনের ব্যাপারটি বাধা হয়ে দাঁড়ায়। ভারতীয় সেনা কমান্ড এ ব্যাপারে তাদের যৌক্তিকতা তুলে ধরে। ভারতীয় বাহিনী একটি প্রত্যক্ষ সামরিক অভিযানে অংশ নেবে বলে সেনা কমান্ড একটি সমন্বিত কেন্দ্রীভূত চেইন অব কমান্ড গঠনের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরে। জেনারেল (এ অ্যাসাইনমেন্টের জন্যই তাঁকে এই পদ দেওয়া হয়) ওসমানীকে যৌথ কমান্ডের যুগ্ম সর্বাধিনায়ক ঘোষণা করায় আমাদের সেনাবাহিনীর উচ্চ কমান্ড খুব একটা খুশি ছিল না। প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন মনে করেন, তাঁর সরকারের রাজনৈতিক বিশ্বাসযোগ্যতা এবং মুক্তিবাহিনীর যোদ্ধাদের শৃঙ্খলা ও আনুগত্য বজায় রাখতে হলে কর্নেল (অব.) ওসমানীসহ মুক্তিবাহিনীর শীর্ষ কর্মকর্তাদের যৌথ কমান্ডের

উচ্চপদে রাখতে হবে। শেষমেশ ইন্দিরা গান্ধীর পীড়াপীড়িতে ডি পি ধর ভারতীয় সেনাবাহিনীর উচ্চ কমান্ডকে এ প্রস্তাবে রাজি করান যে ওসমানী ভারতীয় সেনাবাহিনীর পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ডের কমান্ডিং ইন চিফ জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরার সমান্তরালে থেকে কাজ করবেন।

১৯৭১ সালের ১ থেকে ৩ ডিসেম্বরের মধ্যে যৌথ কমান্ড গঠনের সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এ সিদ্ধান্ত যুদ্ধে সরাসরি কার্যকর হওয়ার কথা ডিসেম্বরের শেষের দিকে। ভারত জানত, তারা একবার যুদ্ধে জড়িয়ে পড়লে মূল কাজটি তাদেরই করতে হবে। মুক্তিবাহিনী হয়তো দেশের ভেতরে প্রশাসন ও যোগাযোগব্যবস্থা ধ্বংস করে দিতে এবং পাকিস্তানি বাহিনীর পূর্বাঞ্চলীয় অংশের সমন্বয় ভেঙে দিতে পারবে। তবে এটাও পরিষ্কার ছিল যে যুদ্ধ শুরু হয়ে গেলে এর নেতৃত্ব দিল্লি ও কলকাতায় সামরিক সদর দপ্তরের হাতেই থাকবে। যৌথ কমান্ড আসলে বাংলাদেশের রাজনৈতিক অস্তিত্ব ও সংবেদনশীলতার প্রতি সম্মান রেখেই গঠন করা হয়েছে। প্রকৃত অর্থে ভারতীয় সেনাবাহিনী যুদ্ধে জড়িয়ে পড়তে শুরু করে সেই অক্টোবরেই। সে সময়ই ভারতীয় কমান্ডো ও মেরিন সেনারা নানা দলে ভাগ হয়ে পূর্ব পাকিস্তানে ঢোকা শুরু করে। তারা আসলে বিশেষায়িত দক্ষতা নিয়ে মুক্তিবাহিনীর অভিযানে পেছন থেকে সমর্থন জুগিয়েছে। প্রশিক্ষিত ভারতীয় সেনাদের উপস্থিতিতে গেরিলাযুদ্ধের কার্যকারিতা বেড়ে যায়। ভারতের সামরিক সমন্বয় কর্মকর্তা বিচ্ছিন্ন যোদ্ধাদের মধ্যে সমন্বয় সৃষ্টি ও তাদের মধ্যকার দ্বন্দ্ব-বিবাদ নিরসনেও ভূমিকা পালন করেছে। মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে অনেক গ্রুপই স্বতন্ত্র যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছিল। টাইগার কাদের সিদ্দিকীর নেতৃত্বে এ রকম একটি দল ছিল। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ভাগনে শেখ ফজলুল হক মনির নেতৃত্বে ছিল আরেকটি দল। এর সঙ্গে সাবেক সামরিক, আধা সামরিক, পুলিশ বাহিনীর অনেক সদস্যই জেনারেল ওসমানী ও মেজর জিয়াউর রহমানের (পরবর্তীকালে বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি) নেতৃত্বে যুদ্ধ করছিলেন।

৩ ডিসেম্বর বিকেলের মধ্যেই মিসেস গান্ধী কলকাতায় তাঁর কাজ সারেন। একটি বিশেষ উড়োজাহাজে তিনি দিল্লির উদ্দেশে কলকাতা ছাড়েন সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টা বা সাতটায়। তাঁর সঙ্গে ছিলেন ডি পি ধর, পশ্চিমবঙ্গের দু-একজন রাজনীতিক এবং আমার ও পিটার সিনাইয়ের মতো মধ্য পর্যায়ের দুজন কর্মকর্তা, যাঁরা বাংলাদেশ নিয়ে কাজ করেন।

বিমানটি লক্ষ্ণৌয়ের কিছুটা পূর্বাকাশে পৌঁছালে পাইলট ডি পি ধরের কাছে এসে বলেন, তাঁকে একবার ককপিটে যেতে হবে। কারণ, দিল্লি থেকে একটি জরুরি বার্তা এসেছে, ধর সাহেবকে একটু কথা বলতে হবে। তিনি তিন থেকে চার মিনিট ককপিটে অবস্থান করে মিসেস গান্ধীর সঙ্গে কথা বলে নিজের আসনে ফিরে এলেন। এরপর আমাদের দিকে ফিরে তিনি বললেন, 'যা ধারণা করা হয়েছিল, বোকাটা ঠিক তা-ই করেছে।' তিনি বললেন, জেনারেল ইয়াহিয়া খান ভারতের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের জম্মু, পাঞ্জাব ও রাজস্থানের বিমান ঘাঁটিতে যুদ্ধপূর্ব অতর্কিত বিমান হামলা চালিয়েছে। তিনি আরও বলেন, জেনারেল ইয়াহিয়া খান ভারতের ভূখণ্ডেও হামলা চালিয়েছে। ভারতের সেনাপ্রধান জেনারেল মানেকশ ইতিমধ্যে পাল্টা ব্যবস্থা নিয়েছেন। পাকিস্তানের বিমান হামলার আশঙ্কায় ভারতের উত্তর ও উত্তর-মধ্যাঞ্চলের বেশির ভাগ এলাকায়ই বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

দিল্লিতে অবতরণের বদলে মিসেস গান্ধীর বিমান লক্ষ্ণৌয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে দুই ঘণ্টার মতো অপেক্ষা করার পর রাত ১০টার দিকে আমাদের বিমান লক্ষ্ণৌ ছেড়ে যায়। আমরা ১০টা ৪৫ মিনিটে পালামে অবতরণ করি। বিমানবন্দরে মিসেস গান্ধীকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য প্রতিরক্ষামন্ত্রী জগজীবন রাম অপেক্ষা করছিলেন। আমরা সবাই সেখান থেকে সরাসরি দক্ষিণ ব্লকে সেনাবাহিনীর সদর দপ্তরে চলে যাই। মিসেস গান্ধী, জগজীবন রাম, সরন সিং ও উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারা সরাসরি অপারেশন রুমে প্রবেশ করেন। জেনারেল মানেকশ ভারতের পশ্চিমাঞ্চলে পাল্টা আক্রমণ হিসেবে কী কী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে তা মিসেস গান্ধী ও তাঁর মন্ত্রীদের অবহিত করেন। তিনি পূর্বাঞ্চলে যুদ্ধ শুরু করার জন্য মিসেস গান্ধীর অনুমতি চান, প্রধানমন্ত্রী সঙ্গে সঙ্গে অনুমতি দেন। এরপর মিসেস গান্ধী দক্ষিণ ব্লকের পশ্চিম শাখার মন্ত্রিপরিষদকক্ষে মন্ত্রিসভার জরুরি বৈঠকে সভাপতিত্ব করার জন্য যান। বৈঠকটি তিনি বিমানে থাকাকালে আহ্বান করেছিলেন। মন্ত্রিসভায় অবিলম্বে পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধ ঘোষণা, বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেওয়া ও নয়াদিল্লিতে বাংলাদেশের কূটনৈতিক মিশন চালু করতে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

৪ ডিসেম্বরের সকালে ভারতের পূর্ব ও পশ্চিমাঞ্চলীয় কমান্ডের সেনারা পাকিস্তানের বিরুদ্ধে পূর্ণাঙ্গ যুদ্ধ শুরু করে। ভারতীয় নৌ ও বিমান বাহিনীকে অবিলম্বে আক্রমণ শুরু এবং পাকিস্তানের জাহাজ ও বিমান চলাচল বাধাগ্রস্ত করার নির্দেশ দেওয়া হয়। ৫ ডিসেম্বর মিসেস গান্ধী ভারতীয় সংসদে বাংলাদেশকে আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি দেওয়ার ঘোষণা দেন। সংসদ সর্বসম্মতিক্রমে তা অনুমোদন করে এবং সামরিক অভিযানের প্রতিও অকুণ্ঠ সমর্থন ব্যক্ত করে। পূর্ব পাকিস্তান হাইকমিশনে কর্মরত বাংলাদেশের সর্বজ্যেষ্ঠ কূটনীতিক হুমায়ুন রশিদ চৌধুরীকে ভারতে বাংলাদেশের প্রথম চার্জ দ্য অ্যাফেয়ার্স হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়। তাঁর মর্যাদা স্বীকৃত হয় এবং সংসদের উভয় কক্ষের অধিবেশনে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হওয়ার মতো বিরল সম্মানও লাভ করেন তিনি।
বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে সামরিক অংশগ্রহণের সমর্থন আদায়ে ভারত কূটনৈতিক তৎপরতাও শুরু করে। ভারত কেন বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে প্রত্যক্ষ সমর্থন দিতে বাধ্য হয়েছে,  সে ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রী মিসেস গান্ধী ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী সরন সিংয়ের তরফ থেকে সংকটের পূর্বাপর ব্যাখ্যাসহ সব রাষ্ট্র ও সরকারপ্রধানের কাছে বার্তা পাঠানো হয়।
ক্রমবর্ধমান এই সংকট মোকাবিলায় জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের এক জরুরি অধিবেশন ডাকা হয় ৪ ডিসেম্বর। জাতিসংঘে পাকিস্তানের দূত আগা শাহী যুক্তরাষ্ট্রের দূত জর্জ বুশ ও চীনা দূত হুয়াং হুয়ার সমর্থনে দাবি করেন, নিরাপত্তা পরিষদ যেন ভারতের বিরুদ্ধে অবিলম্বে ব্যবস্থা নেয়। সোভিয়েত দূত জ্যাকব মালিক ভারতকে সমর্থন করে বক্তৃতা করেন। তিনি ভারতের পদক্ষেপের যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা করেন। নিরাপত্তা পরিষদ ভারত-পাকিস্তান তৃতীয় যুদ্ধের বিষয়ে তার গভীর চিন্তার কথা জানালে ভারতীয় দূত সমর সেন ৪ ডিসেম্বর পরিস্থিতির সারসংক্ষেপের সঙ্গে ভারতের প্রত্যয়ের কথা জানান,  ‘কেউ প্রস্তাব পেশ করে বা অনুরোধ করে আমাদের পথ থেকে দূরে সরাতে পারবে না। যে যুদ্ধবিরতির কথা আমি ইতিমধ্যে বলেছি,  তা ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে নয়। সেটা পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ও বাংলাদেশের জনগণের মধ্যে। ফলে এ ব্যাপারে বেশি অগ্রসর হওয়ার আগে আমাদের তাদের কথা শুনতে হবে।’

*জে এন দীক্ষিতের লিবারেশন অ্যান্ড বিয়ন্ড: ইন্দো-বাংলাদেশ রিলেশন্স বই থেকে প্রতীক বর্ধনের অনুবাদ*

**জে এন দীক্ষিত: তৎকালীন ভারতীয় উপ সচিব;  পরে পররাষ্ট্র সচিব**

# সাঁতারু মুক্তিবাহিনীর অজানা বীরত্বগাথা

চারটি টাস্কফোর্সে বিভক্ত ছিল সাঁতারু মুক্তিবাহিনী। এরা ছিল চট্টগ্রাম, চালনা-খুলনা, নারায়ণগঞ্জ এবং দাউদকান্দি-চাঁদপুরে। প্রতিটি সেক্টরে ছিল চারটি করে টাস্ক ইউনিট। প্রত্যেক টাস্ক ইউনিটের ছিল ১০টি করে টাস্ক এলিমেন্ট। প্রতিটি টাস্ক এলিমেন্টে ছিলেন তিনজন করে সাঁতারু যোদ্ধা। প্রত্যেক যোদ্ধার ছিল প্রথমে একটি, পরে দুটি করে লিমপেট মাইন, একটি গ্রেনেড, একটি ছোরা, সাঁতারের জন্য পায়ে বাঁধা এক জোড়া তাড়নি এবং একটি করে কবজিতে বাঁধা কম্পাস জলপথে যাঁরা যুদ্ধ করেছিলেন সেসব বাঙালি গেরিলাকে মুক্তিবাহিনীর অন্য যোদ্ধাদের থেকে আলাদাভাবে পরিচয় করানোর প্রয়োজন আছে। কেননা, তাঁদের বীরত্বের কাহিনি অকথিত। তাঁদের নাম দেওয়া চলে ফ্রগমেন। তাঁরা অন্তর্জলের সাঁতারু, মুখে শ্বাসযন্ত্র আর পায়ে তাড়নি বেঁধে জলের নিচে সাঁতার কাটায় ছিলেন সুদক্ষ। এই মুক্তিযোদ্ধা সাঁতারু বাহিনীর সাহসিকতা, দৃঢ়তা ও ত্যাগের কাহিনি আজও, সিকি শতাব্দী পেরিয়ে যাওয়ার পরেও, অকথিত অজ্ঞাত রয়ে গেছে।

**যেভাবে সংগঠিত হলো**

সাঁতারু বাঙালি মুক্তিযোদ্ধাদের মূল অংশটি গঠিত হয়েছিল বাঙালি নাবিকদের একটা মূল অংশকে ঘিরে, যাঁরা তৃতীয় পাকিস্তানি দাফনি সাবমেরিন ‘মানগ্রো’ থেকে পালিয়ে গিয়েছিলেন। এই দুঃসাহসী বাঙালি নাবিকেরা ফ্রান্সে পাকিস্তানি সাবমেরিন থেকে পালিয়ে স্পেনে চলে যান। স্পেন থেকে তাঁরা পূর্ব বাংলায় ফিরে আসার পথ বের করেন। পরে এতে যোগ দেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইকবাল হল ও জগন্নাথ হলের তরুণ ছাত্র এবং চট্টগ্রাম, সিলেট ও খুলনার তরুণ যুবকের দল। পূর্ব বাংলার দ্রুত প্রবহমান নদীগুলো থেকে যথাসম্ভব সুবিধা নেওয়ার মতো সাঁতারু কৌশল ও অফুরন্ত প্রাণশক্তির অধিকারী তাঁরা ছিলেন। সম্পূর্ণ অন্ধকারে তাঁদের ডজন ডজন মাইল সাঁতরাতে হতো, বাঁশ বা পেঁপে পাতার চোঙা দিয়ে শ্বাস-প্রশ্বাস নিয়ে জমকালো অন্ধকার পানিতে মাইন বহন করে শত্রুপক্ষের কাছাকাছি রেখে সেটি বিস্ফোরিত হওয়ার আগেই সাঁতারে নিরাপদ দূরত্বে ফিরে যেতে হতো, যা কিনা প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত জেমস বন্ড ধরনের কমান্ডোদের জন্যও একটা কঠিন কাজ। এ ধরনের কাজের জন্য যে দৈহিক ও মানসিক শক্তিমত্তার প্রয়োজন পূর্ব বাংলার তরুণ যুবকদের তা প্রচুর পরিমাণে ছিল। তাই সাঁতারু বা ফ্রগমেন বাহিনীর নেতৃত্ব শুরুর দিকে নৌবাহিনীর সদস্যদের হাতে থাকলেও অচিরেই তা চলে যায় বিপুলভাবে উদ্দীপিত শিক্ষিত যুবকদের হাতে।

সাঁতারু মুক্তিবাহিনীতে ১৩০ জন ছিলেন চট্টগ্রামের, খুলনা-চালনা অঞ্চলের ছিলেন ১০০ জন, ৪০ জনকে নেওয়া হয় নারায়ণগঞ্জ থেকে এবং ৩০ জনকে চাঁদপুর, দাউদকান্দি এলাকা থেকে। তাঁদের ছিল সেই সাহসিকতা আর প্রাণশক্তি যার বলে তাঁরা এ রকম কষ্টকর, বিপজ্জনক ও দুঃসাহসী অভিযানে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। এ রকম কাজ সাধারণত দেওয়া হয় উচ্চ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত স্পেশাল সার্ভিস গ্রুপকে, যাঁদের বলা হয় মেরিন কমান্ডো, উন্নত নৌবাহিনীতে তাঁদের বলা হয় ‘সিলস’। সাঁতারু মুক্তিবাহিনীর অধিকাংশ সদস্য ছিলেন মুসলমান। যে অল্পসংখ্যক হিন্দু যোদ্ধা ছিলেন তাঁরা খতনা করেছিলেন, তাঁরা ভেবেছিলেন ধরা পড়লে এতে অন্তত প্রাণে বাঁচার সম্ভাবনা থাকতে পারে। পাকিস্তান নৌবাহিনীর বাঙালি অফিসাররা করাচিতে গৃহবন্দী অবস্থায় ছিলেন। একজন লেফটেন্যান্ট ছুটিতে পূর্ব পাকিস্তানে ছিলেন এবং একজন কমান্ডার ১৯৭১ সালের নভেম্বরে পালিয়ে যেতে সক্ষম হন। মুক্তিবাহিনীতে নৌবাহিনীর সদস্যদের মধ্যে মাত্র এই দুজনই অংশ নিতে পেরেছিলেন। সম্ভবত সে কারণেই পূর্ব পাকিস্তানের বদ্বীপ অঞ্চলে নৌ-মুক্তিসেনাদের নেতৃত্ব গিয়েছিল শিক্ষিত এবং দৈহিকভাবে শক্তসামর্থ্য যুবকদের হাতে।

## সাংগঠনিক কাঠামো

চারটি টাস্কফোর্সে বিভক্ত ছিল সাঁতারু মুক্তিবাহিনী। এরা ছিল চট্টগ্রাম, চালনা-খুলনা, নারায়ণগঞ্জ এবং দাউদকান্দি-চাঁদপুরে। প্রতিটি সেক্টরে ছিল চারটি করে টাস্ক ইউনিট। প্রত্যেক টাস্ক ইউনিটের ছিল ১০টি করে টাস্ক এলিমেন্ট। প্রতিটি টাস্ক এলিমেন্টে ছিলেন তিনজন করে সাঁতারু যোদ্ধা। প্রত্যেক যোদ্ধার ছিল প্রথমে একটি, পরে দুটি করে লিমপেট মাইন, একটি গ্রেনেড, একটি ছোরা, সাঁতারের জন্য পায়ে বাঁধা এক জোড়া তাড়নি এবং একটি করে কবজিতে বাঁধা কম্পাস। প্রত্যেকটি টাস্ক ইউনিটের ছিল একটি করে গুলিভরা রাইফেল। এই সামান্য অস্ত্র সরঞ্জাম নিয়ে বাঙালি সাঁতারু মুক্তিবাহিনীর যুবকেরা যে অবিশ্বাস্য কাজ করেছেন, শত্রুপক্ষের যে বিপুল ক্ষয়ক্ষতি সাধন করেছেন, তা পৃথিবীর গেরিলা যুদ্ধগুলোর ইতিহাসে বিরল।

সর্বোচ্চ সাফল্য লাভের উদ্দেশ্যে তাঁরা প্রথম আক্রমণটি চালান একসঙ্গে একজোটে কয়েকটি স্থানে। সেটা ছিল একাত্তরের আগস্ট মাসের ১৫-১৬ তারিখের অন্ধকার রাত। একসঙ্গে তাঁরা আক্রমণ করেন চট্টগ্রাম, চালনা, খুলনা এবং নারায়ণগঞ্জ, চাঁদপুর ও বরিশালের নদীবন্দরগুলোর ওপর। পাকিস্তানি বাহিনী তাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত মনে করত বলে একসঙ্গে এতগুলো পয়েন্টে এমন অতর্কিত হামলায় তারা হকচকিত হয়ে গিয়েছিল।

## হার্ডিঞ্জ ব্রিজে হামলা

### ৩০ আগস্ট ১৯৭১

দক্ষিণাঞ্চলের নদীবন্দরগুলো ও জলপথগুলোর ওপর যখন আক্রমণ অব্যাহত রয়েছে তখন, আগস্টের শেষ দিকে সাঁতারু মুক্তিবাহিনীর একটি দল উত্তরে রাজশাহীর দিকে অগ্রসর হয়। তাদের লক্ষ্য পদ্মা নদীর ওপরের হার্ডিঞ্জ ব্রিজ। হার্ডিঞ্জ ব্রিজ পদ্মা পেরিয়ে কুষ্টিয়া থেকে রাজশাহী-পাবনার দিকে রেল যোগাযোগের গুরুত্বপূর্ণ পথ। ১৩ জন সাঁতারু মুক্তিযোদ্ধা রাজশাহী পৌঁছান। তারপর তাঁরা সারদা নদী পেরিয়ে চারঘাটের দিকে এগোন এবং দাদুপুর চরে গিয়ে আশ্রয় নেন।

সাঁতারু দলের মধ্যে মোহাম্মদ কাইয়ূম হোসেন কাদের ও ওয়াহিদুল ইসলাম ছিলেন এই এলাকার মানুষ। তাঁরা একটি দেশি নৌকা ছিনতাই করেন এবং ২১ হেরিক চার্জসহ আটজন সাঁতারুকে ওই নৌকায় লুকিয়ে রাখেন। একটা মোটরবোট ওই নৌকাটিকে টেনে নিয়ে যায় রাইতা পয়েন্ট পর্যন্ত, যা হার্ডিঞ্জ ব্রিজ থেকে আধা মাইল উজানের দিকে। দেশি নৌকাটি তারপর মোটরবোট থেকে আলাদা হয়ে নিজে ব্রিজের কেন্দ্রীয় পিলারের দিকে অগ্রসর হয়। সবার অগোচরে সেটি সেখানে পৌঁছায় ৩০ আগস্ট রাত একটায়। নৌকাটি রক্ষা করার জন্য দুজনকে সাঁতরে ব্রিজটির বিপরীত পাশের পিলারগুলোর দিকে যেতে হতো, কিন্তু তীব্র স্রোতের কারণে দুজন সাঁতারু তা করতে ব্যর্থ হন। তখন নোঙর ফেলা হয় সরাসরি ব্রিজটির নিচেই। নৌকাটি ঝাঁকুনি খেয়ে আটকে যায় এবং তৎক্ষণাৎ নৌকার সম্মুখভাগ তীব্র স্রোতের কারণে পানিসীমার নিচে একটা গোত্তা খায়। বৈঠাচালক ভয় পেয়ে পুরো শিকল খুলে ছুড়ে ফেলে দেন। তখন নৌকাটি ভাটির দিকে চলে যায় এবং খুব কষ্টে সে রাতের জন্য রক্ষা পায়।

পরের দিন রাত ১০টায় দ্বিতীয়বারের মতো তাঁরা চেষ্টা করেন। কিন্তু এবারও ব্যর্থ হন। তৃতীয়বার তাঁরা তীরের কাছাকাছি একটা পিলারকে লক্ষ্য হিসেবে নেন। এবার তাঁদের সফলতার সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু ব্রিজের ওপর থেকে সেন্ট্রিরা নৌকার ওপর গুলি করে। মুক্তিযোদ্ধারা লাফিয়ে পড়ে ভাটির দিকে সাঁতরাতে থাকেন। এরই মধ্যে নিকটস্থ একটা রাজাকার ক্যাম্পকে সৈন্যরা সতর্ক করে দেয়। রাজাকাররা কাদির এবং ওয়াহিদকে ধরে ফেলে। এরপর তাঁদের আর কোনো খোঁজ পাওয়া যায়নি।

অন্যরা আশপাশের আখখেতে গা-ঢাকা দেন এবং প্রায় মাঝরাতের দিকে পৌঁছান বাজুমেরা। তারপর আবদুলপুর-নন্দনগাছির মধ্যে রেলপথের ওপরে আড়ানি সেতু নষ্ট করে তাঁরা তাঁদের ঘাঁটিতে ফিরে যান। হার্ডিঞ্জ ব্রিজ আক্রমণের ব্যাপারে সাঁতারু মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে দ্বিধাদ্বন্দ্ব কাজ করছিল। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও মূল্যবান এই জাতীয় সম্পদ স্বাধীনতার পর বাঙালিকেই মেরামত করতে হবে এবং তার পেছনে অনেক শ্রম ও অর্থ ব্যয় হবে, এমন উপলব্ধি তাঁদের দ্বিধান্বিত করেছিল।

মুক্তিবাহিনীর সাঁতারু দল ছিল একটি ছোট্ট গেরিলা বাহিনী, পূর্ব বাংলার নদীনালা খালেবিলে এরা মাছের মতোই

স্বচ্ছন্দে চলতে পারত। এই স্বল্পসংখ্যক তরুণ-যুবক তাঁদের অপরিসীম সাহসিকতা, মাতৃভূমির জন্য ভালোবাসা, কষ্টসহিষ্ণুতা আর দৃঢ়তার বলে চট্টগ্রাম, চালনা, মংলা ও খুলনা পূর্ব পাকিস্তানের এ প্রধান চারটি বন্দর অচল করে দিয়েছিলেন। দেশের অভ্যন্তরীণ নৌপথগুলোতে অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়। বন্দরগুলোর পরিচালকেরা বন্দর বন্ধ করে দিতে বাধ্য হন। বিদেশি জাহাজ কোম্পানিগুলো তাদের জাহাজ পূর্ব পাকিস্তানে প্রবেশের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে। ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর সাঁতারু মুক্তিবাহিনী ভারতীয় নৌবাহিনীর সঙ্গে যুক্ত হয়ে যুদ্ধ চালিয়ে যায়। তার মাত্র ১০-১২ দিনের মধ্যে পাকিস্তানি বাহিনীর পরাজয় ঘটে এবং স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটে।

*ভাইস অ্যাডমিরাল মিহির কে রায়ের ওয়ার ইন দি ইন্ডিয়ান ওশান বই থেকে মশিউল আলমের অনুবাদ*

**ভাইস অ্যাডমিরাল মিহির কে রায় পিভিএসএম, এভিএসএম: ভারতীয় নৌবাহিনীর কর্মকর্তা**

# সংবাদ সংগ্রহ

১৯৭১ সালের ১৪ ডিসেম্বর আমাদের বেতার যন্ত্রচালক করপোরাল বি পি সিং ১০টা ৪৫ মিনিটে আমার কাছে একটা লগ নিয়ে এলেন। তাতে ছিল ঢাকার গভর্নর হাউস ও পশ্চিম পাকিস্তানের সরকারি কর্মকর্তাদের মধ্যকার আলাপচারিতা। আমি ভেবেছিলাম, এটা কোনো নৈমিত্তিক কথাবার্তা। করপোরাল সিং জানালেন, আলাপটা গোপনীয়। সেটা শুনতে ও রেকর্ড করতে তাঁকে সংকেত ভাঙার পদ্ধতি ব্যবহার করতে হয়েছে। এ কথা শুনে আমি বেশ উৎসুক হয়ে উঠলাম।

লগবুক পরীক্ষা করে আমি আলাপচারিতার অডিও রেকর্ডটি আনতে বললাম। লক্ষ করে দেখলাম, যে তরঙ্গে ওই আলাপটি ধরা হয়েছে, তা সাধারণত কৌশলগত ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়। আলাপে গভর্নর হাউসে সে দিন বিকেলে একটি বৈঠকের কথা উল্লেখ করা হয়। গভর্নর নিজে তাতে সভাপতিত্ব করবেন। বৈঠকে যাঁরা উপস্থিত থাকবেন, তাঁদের নাম শুনে আমার চোখ জ্বলজ্বল করে উঠল। বৈঠকে অন্যান্যের মধ্যে থাকবেন জেনারেল টিক্কা খান, সামরিক আইন প্রশাসক, এওসি, পিএএফ, ঢাকা (বিমানবাহিনীর আঞ্চলিক প্রধান)। রেকর্ডটি আমি বারবার শুনলাম। তারপর যন্ত্রচালককে সেটা টাইপ করে দিতে বললাম।

দুর্ভাগ্যক্রমে, আমাদের ওসি স্কোয়াড্রন লিডার কাপুর সে দিন ছিলেন না। তাঁর মা গুরুতর অসুস্থ থাকায় তাঁকে লখনৌ যেতে হয়েছিল। ১৯৭১ সালের যুদ্ধের তখন বেশ সংকটাপন্ন অবস্থা। যে কথাগুলো আমি শুনেছি, তা যে গুরুত্বপূর্ণ, তা বুঝতে পেরেছিলাম। সে দিনই ১২টা ৫০ মিনিটে এডিএসআইকে (বিমান) নির্ধারিত লাইনে ফোন করে বিষয়টি আমি জানালাম। এক ঘণ্টা পর, উইং কমান্ডার ব্যানার্জি আমাকে ফোন করে জিজ্ঞাসা করলেন, এসব আলাপচারিতার কোনো অডিও রেকর্ড আছে কি না। আমার কাছ থেকে নিশ্চিত হওয়ার পর তিনি বললেন, আমি নিজেই যেন সেটা পরিদপ্তরে নিয়ে যাই।

বাকি ঘটনা তো ইতিহাস।

**ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট এম এল বালা: ভারতের তৎকালীন ওয়্যারলেস এক্সপেরিমেন্টাল ইউনিটের সদস্য**

# টাঙ্গাইলে প্যারাড্রপ

হেলিকপ্টারগুলো যখন পূর্ব প্রান্তে ৪ নম্বর কোরের সৈন্য ও যুদ্ধের সাজসরঞ্জাম মেঘনা পার করে দিচ্ছে, সে সময়েই দেশের মধ্যভাগে সেনাবাহিনী আর বিমানবাহিনী মিলে আরেকটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ কাজ করে চলেছিল।

যুদ্ধের পরিকল্পনার সময়েই যেখানে প্রয়োজন সেখানে নিয়োগ দেওয়ার জন্য প্রধান সামরিক কার্যালয় থেকে এক ব্যাটালিয়ন, মানে ৮০০ থেকে এক হাজার, প্যারাট্রুপার পূর্ব-সামরিক কমান্ডের নেতা লেফটেন্যান্ট জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরার অধীনে দেওয়া হয়। সাধারণত তিনটি ব্যাটালিয়ন মিলিয়ে একটা ব্রিগেড হয়। এই প্যারা-ব্রিগেডের বাকি অংশ পূর্বাঞ্চলেই রাখার সিদ্ধান্ত হলো। প্রধান সামরিক কার্যালয়ের নির্দেশে সেখানে তাদের রিজার্ভে রাখা হলো, যাতে যখন যেখানে প্রয়োজন নিয়োগ দেওয়া যায়। অক্টোবর অবধি জেনারেল অরোরার পরিকল্পনা মোটের ওপর তৈরি হয়ে গেল। একটা ব্যাটালিয়নে তিনটি বা চারটি কোম্পানি হয়, একেকটা কোম্পানিতে ১৫০ থেকে ৩০০ পর্যন্ত লোক হতে পারে।

২ নম্বর কোরের অধিনায়ক ছিলেন লেফটেনেন্ট জেনারেল টি এন রায়না। কোরে দুই বা তিন ডিভিশনে বিভক্তপ্রায় ৭০ হাজার সৈন্য। ৯ নম্বর ডিভিশনের দায়িত্ব ছিল দক্ষিণ-পশ্চিম দিক, মানে কলকাতার দিক থেকে আক্রমণ করে প্রথমে যশোর দখল করা। এদের সঙ্গে তিনি কিছু প্যারাট্রুপার রাখলেন। উত্তর দিকে থেকে যারা আক্রমণ করবে, বাকি প্যারাট্রুপারদের রাখলেন তাদের সঙ্গে।

সীমানায় ঘোর লড়াই হলো। বিমানবাহিনী থেকে ক্যানবেরা, ন্যাট, হান্টার, সুখয়, মিগ-সবাই সৈন্যবাহিনীকে সাহায্য করল। কিন্তু সুরক্ষিত যশোর শহরে লড়াই হলোই না। একটিও গুলি না চালিয়ে পাকিস্তানিরা যশোর ছেড়ে পিছু হটে গেল। ৭ ডিসেম্বর ভারতীয় সৈন্যরা যশোর দখল করে নিল। পাকিস্তানি সেনারা দুই ভাগ হয়ে এক ভাগ গেল দক্ষিণে খুলনার দিকে, অন্য ভাগ গেল উত্তরে কুষ্টিয়ার দিকে। আমাদের ৪ নম্বর ডিভিশন যশোরের উত্তরে ঝিনাইদহ দখল করল। পাকিস্তানি বাহিনী আরও পিছিয়ে মাগুরা অবধি চলে গেল।

এরপর ঢাকার কাছে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর বাইরে অন্তরায় হয়ে রইল ব্রহ্মপুত্র। ঠিক হলো, এ বাধা অতিক্রম করার জন্য প্যারাট্রুপার্স ব্যবহার করা হবে। কথা হলো, ২ নম্বর প্যারা-ব্যাটালিয়নকে ১১ ডিসেম্বর বেলা চারটায় টাঙ্গাইলে নামানো হবে।

কেন ১১ তারিখ? কেন বেলা চারটায়? কেন অন্য কোথাও না হয়ে কেন টাঙ্গাইলে? আমাদের পরিকল্পনা ছিল, পশ্চিম, উত্তর-পশ্চিম এবং পূর্ব—এই তিনদিক থেকে এক এক কোর, অর্থাৎ প্রায় ৭০ হাজার সৈন্য নিয়ে পূর্ব পাকিস্তানকে আক্রমণ করা হবে। এর মধ্যে উত্তরে কামালপুর, জামালপুর, ময়মনসিংহের দিকে সৈন্যসংখ্যা কিছু কম ছিল। তাই ঠিক হলো, ওই দিকে প্যারাট্রুপারদের দেওয়া হবে। মুক্তিবাহিনী খবর দিল, টাঙ্গাইলে সৈন্য নামালে ওখানকার বাসিন্দারা তাদের সাহায্য করবে। তা ছাড়া জামালপুর-ময়মনসিংহ থেকে ঢাকার দিকে যে রাস্তাটি এসেছে, টাঙ্গাইল সেই রাস্তার ওপর। কাজেই ওদিক থেকে পাকিস্তানি সৈন্যরা পিছু হটতে বা ঢাকায় সাহায্য করতে ঢাকার দিকে আসে, তাহলে আমাদের সৈন্যরা সেটা প্রতিরোধ করতে পারবে।

১১ তারিখ কেন? জেনারেল অরোরা অনুমান করেছিলেন, যুদ্ধ আরম্ভ হলে উত্তর সীমান্ত থেকে ওই জায়গা পর্যন্ত পৌঁছাতে আমাদের এক সপ্তাহ লেগে যেতে পারে। কেন বেলা চারটায়? প্রথমে ভাবা হয়েছিল, ঘটনাটা ঘটানো হবে রাতে। কিন্তু পাকিস্তান বিমানবাহিনী পুরোপুরি অক্ষম হয়ে পড়েছিল বেল সাবধানতার আর কোনো প্রয়োজন রইল না। আমাদের দেশের পূর্বাঞ্চলে শীতের দিনে বেলা চারটায় সন্ধ্যা নামতে শুরু হয়। সৈন্যরা পৌঁছানোর সময় সামান্য

আলো থাকবে। তাতে সুবিধা হবে। তারপর রাতের অন্ধকারে গা-ঢাকা দিয়ে দেবে।

বিষয়টা খুবই গোপন রাখা সম্ভব হয়েছিল। আকস্মিকতার কারণে মানুষ বুঝতেও পারল না, কত লোক নামানো হয়েছে। অনেক সংবাদপত্র, এমন কি বিবিসিও বলল, এক ব্রিগেড, মানে হাজার আড়াই সৈন্য নামানো হয়েছে। আসলে নামানো হয়েছিল এক ব্যাটালিয়ন, অর্থাৎ প্রায় ৮০০ সৈন্য।

এই যৌথ প্রয়াসের ব্যবস্থা নিতে নভেম্বরের গোড়ায় কলকাতায় পূর্বের বিমানবাহিনীর প্রধান কার্যালয়ের অধীনে একটা কার্যালয় স্থাপন করা হলো। এটি যুক্ত রইল দিল্লিতে বিমানবাহিনীর প্রধান কার্যালয়ের পরিবহন বিভাগের সঙ্গে। এএন ১২-এর অভিজ্ঞ পাইলট গ্রুপ ক্যাপ্টেন গুরুদীপ সিং রইলেন এর শীর্ষে। ঠিক হলো, ৫০টা পরিবাহক বিমান-২২টা ডাকোটা, ২০টা প্যাকেট, ৬টা এএন ১২ আর ২টা ক্যারিবু-একসঙ্গে এ কাজটা করবে। কিছু সৈন্য ছিল যারা প্যাকেট থেকে লাফাতে জানে, কিন্তু ডাকোটা থেকে কখনো লাফ দেয়নি। সে কারণে কিছুটা শিক্ষা ও অভ্যাসের ব্যবস্থা করতে হলো।

ডাকোটাগুলো জড়ো হলো (খড়গপুরের কাছে) কলাইকুন্ডায়, প্যাকেটগুলো দমদমে। এএন-১২-এর আস্তানা প্রথমে ছিল চণ্ডীগড়। কিন্তু জায়গাটা পাকিস্তানি সীমানার খুব কাছে। তাদের সরিয়ে দেওয়া হলো উত্তর প্রদেশের গোরখপুরে। আর একটা এএন-১২-এর স্কোয়াড্রন রাখা হলো বেরিলিতে। কীভাবে সেগুলো উড়বে? পাইলটরা বলল, তারা একটা লম্বা বাঁকা লাইনে যেতে চায়। মহড়া চলল। এএন-১২-এর নাগপুরে, প্যাকেটগুলোর এলাহাবাদে ‘ফাফামাউ’য়ে, ডাকোটাগুলোর কলাইকুণ্ডায়।

৪ ডিসেম্বর সন্ধ্যায় পূর্ব পাকিস্তানের বিমানবাহিনী যখন আমাদের আক্রমণ করল না, তখন এএন ১২-গুলোর ২৫ নম্বর স্কোয়াড্রনকে এল-৭০ কামানগুলো হাসিমারা থেকে আগ্রায় পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব দেওয়া হলো। ১০ ডিসেম্বর দুপুরে হুকুম দেওয়া হলো পরদিন সকালে দমদম পৌঁছানোর। তারা আর প্যাকেটগুলো একত্রে সমবেত হলো। তাদের কী করতে হবে মানচিত্র ও ছবি দিয়ে তা বুঝিয়ে দেওয়া হলো। ১১ ডিসেম্বর সকাল সাড়ে নয়টায় কলাইকুণ্ডার বিমানঘাঁটিতে ২২টা ডাকোটা রওনা দেওয়ার জন্য সারি বেঁধে দাঁড়িয়ে গেল। এক ব্যাটালিয়ন, মানে প্রায় ১০০ জন প্যারাট্রুপার ব্রহ্মদেশের আকিয়াবে নিয়ে যাওয়ার জন্য ১৯৪৫-এর ২৯ এপ্রিলে কলাইকুণ্ডায় একইভাবে সারি বেঁধে দাঁড়িয়েছিল ৩৮টা ডাকোটা। সে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কথা।

৬ ডিসেম্বর থেকে পূর্ব পাকিস্তানে পাকিস্তানি বিমানবাহিনীর ওড়া বন্ধ হয়ে যাওয়ার পরও দমদম থেকে কিছু ‘ন্যাটস’ ডাকোটা বাহিনীর রক্ষক হিসেবে সঙ্গে দেওয়া হলো। কলকাতার বোটানিক্যাল গার্ডেনে প্যারা-ক্যাম্প করা হয়েছিল। চার রকমের ৫০টা উড়োজাহাজ। গতিবেগ ভিন্ন ভিন্ন। অতি সতর্কতার সঙ্গে হিসাব করা হলো, কে ঠিক কোন মুহূর্তে মাটি ছেড়ে উঠবে, কে কোন দিক দিয়ে যাবে, কতটা উঁচুতে উড়বে। সব বিমান রওনা হওয়ার ২০ মিনিট আগে দুটি পথপ্রদর্শক প্যাকেট রওনা দিল। সৈন্যদের নামার নির্দিষ্ট স্থান ছিল টাঙ্গাইলের মাইল পাঁচেক উত্তর-পূর্বে, জামালপুর-ময়মনসিংহ থেকে আসা রাস্তার ওপর। ৫০ মিনিটে ৫০টি অ্যারোপ্লেন নিজেদের কাজ সুসম্পন্ন করে নিল। সেদিন জোরে হাওয়া বইছে। প্রথমে পৌঁছাল দুটি ক্যারিবু। তারা নির্দিষ্ট জায়গার একটু দূরে প্রথমে কয়েকটা মানুষের মতো পুতুল ফেলল। তারপর সৈন্যদের সঙ্গে জিনিসপত্র ভালো করে বেঁধে নিয়ে তাদের ফেলা হলো। প্রত্যেকে নিল চার দিনের মতো খাবার। অস্ত্রশস্ত্রসহ একেকজনের বোঝা প্রায় ২৫ কিলোগ্রাম করে। এক-আধটু গন্ডগোল বাদে নামানোর ব্যাপারটা মোটের ওপর নির্বিঘ্নেই সারা গেল। ১৯ জন সৈন্য নামল অন্য সৈন্যদের চেয়ে ১১ মাইল দূরে। বিপক্ষের সঙ্গে কিছুটা লড়াই করে নিজেদের দলের কাছে তাদের আসতে হলো। এসে পৌঁছাতে লাগল এক দিন। একটা প্যাকেট থেকে একটা কামান আর দুটি জিপ চার মাইল দক্ষিণে গিয়ে পড়ল। চারটি জিপ গিয়ে পড়ল একটা পুকুরে। ভাগ্যিস, পুকুরটা গভীর ছিল না। একটা প্যাকেটের ইঞ্জিনে কিছু গোলমাল হলো। জনা চল্লিশেক সৈন্য নিয়ে তাকে দমদম ফিরে যেতে হলো। তাদের আবার পাঠানো হলো পরদিন। একটা এএন-১২-এ নিচে থেকে বিপক্ষের গুলি লাগল। বেশির ভাগ সৈন্য ও যুদ্ধের সরঞ্জাম আড়াই বর্গমাইল জায়গার মধ্যে পড়ল।

জামালপুর থেকে আমাদের যে সৈন্যরা ঢাকার দিকে যাচ্ছিল, তাদের সঙ্গে ওরা মিলিত হলো পরদিন দুপুরবেলা। আমাদের খুব বেশি ক্ষতি হয়নি। কিন্তু এগিয়ে যাওয়ার জন্য গাড়ির মারাত্মক অভাব দেখা দিল। যে যাতে পারল তাতেই চড়ে বসল, এমন কী সাইকেল-রিকশায় পর্যন্ত।

পূর্ব পাকিস্তানের আত্মসমর্পণের দিন, পূর্ব সীমান্তে আমাদের রক্ষীবাহিনীর তিন অধ্যক্ষের গৌরবের দিন। অনুষ্ঠানে উচ্চপদস্থ সবাই উপস্থিত হলেন। আমাদের পূর্ব এয়ার কমান্ডের অধ্যক্ষ এয়ার মার্শাল দেওয়ান পাকিস্তান বাহিনীর নেতা জেনারেল নিয়াজীকে জিজ্ঞাসা করলেন 'আপনার হাতে তো লড়াই করার মতো কিছু সৈন্য ছিল। তার পরও আপনারা এত শিগগির হাল ছেড়ে দিলেন কেন?' গ্রুপ ক্যাপ্টেন চন্দন সিং পাশেই দাঁড়িয়েছিলেন। তাঁর বুকের ওপর বিমানবাহিনীর চিহ্ন 'উইংস' বা ডানার চিহ্ন। সেটার ওপর অঙ্গুলিনির্দেশ করে জেনারেল নিয়াজী বললেন, 'এদের জন্য। এই বিমানবাহিনীর জন্য গত কয়েকটা দিনরাত কোনো সময়ে কোনো জায়গায় আমি আর আমার অনুচররা চোখের দুই পাতা এক করতে পারিনি। ক্লান্ত হয়ে গেছি। আর যুদ্ধ করতে পারলাম না। তাই আত্মসমর্পণ করতে হলো। আর কোনো গতি রইল না।'
পূর্বাঞ্চলের বিদ্যুৎগতি যুদ্ধের সমাপন হলো। কিন্তু পশ্চিম প্রান্তে তখনো যুদ্ধের আগুন জ্বলছে।

*এয়ার চিফ মার্শাল পি সি লালের একজন বৈমানিকের আত্মজীবনী বই থেকে*

**এয়ার চিফ মার্শাল পি সি লাল: সে সময়ে ভারতীয় বিমান বাহিনীর প্রধান**

# বিমান আক্রমণ

১৪ ডিসেম্বর ১৯৭১। আমি তখন সবে ময়নামতিতে একটি ক্লোজ সাপোর্ট মিশন শেষে ফিরে এসেছি। (গুয়াহাটি বিমান ঘাঁটির অধিনায়ক) গ্রুপ ক্যাপ্টেন উলেন দৌড়ে পরিচালনাকক্ষে এসে আমাকে বলেন, 'ভুপ, বিমান সদর দপ্তর আমাদের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি কাজের দায়িত্ব দিয়েছে। ঢাকার সার্কিট হাউসে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বৈঠক চলছে। সেখানে বেলা ১১টা ২০ মিনিটে হামলা করতে হবে।'

তাঁকে বললাম, ১০টা ৫৫ মিনিট তো এখনই বাজছে। এখান থেকে ঢাকায় উড়ে যেতে ২১ মিনিট লাগবে। তা ছাড়া, 'এই সার্কিট হাউসটাই বা কোথায়?'

তিনি বললেন, 'ঝটপট কাজ করলে হয়তো কাঁটায় কাঁটায় ধরা যাবে। আমার কাছে ঢাকার একটি পর্যটন মানচিত্র আছে। এখানে এই যে এই সড়ক সংযোগ, এর পরই সার্কিট হাউস।'

তাঁর দিকে তাকিয়ে বললাম, ঢাকার যে জায়গাটায় সার্কিট হাউসের অবস্থান, সেটা খুবই ঘনবসতিপূর্ণ। আর আকাশ থেকে তো সড়ক সংযোগ দেখা যায় শত শত। ওই সংযোগ সড়কটা কীভাবে খুঁজে পাওয়া সম্ভব? তাঁকে বললাম, 'ঠিক আছে, স্যার, কাজটা হয়ে যাবে।' তাঁর কাছ থেকে আমি মানচিত্রটি নিলাম, যাতে ঢাকার আকাশে পৌঁছে সার্কিট হাউসটি

খুঁজে নিতে পারি।

সে অভিযানের জন্য আমি চারটি মিগ-২১ বিমান নিলাম। প্রতিটাতে উচ্চ বিস্ফোরণের ক্ষমতাসম্পন্ন ৩২টি করে রকেট ছিল। ককপিটে বসে ফিতা বেঁধে ইঞ্জিন চালু করার পর দেখলাম, আমাদের একজন ফ্লাইট কমান্ডার একটি কাগজ নেড়ে নেড়ে দৌড়ে আমার দিকে আসছে, 'স্যার, এটা আপনার জন্য।' তাতে লেখা ছিল, 'লক্ষ্যবস্তু গভর্নমেন্ট হাউস। আবার বলছি, গভর্নমেন্ট হাউস, সার্কিট হাউস নয়। বুঝেছেন কি না, সেটা নিশ্চিত করুন। শুভকামনা, আপনার শিকার সফল হোক। মল (গ্রুপ ক্যাপ্টেন উলেনের ডাকনাম)।'

আমি বুড়ো আঙুল তুলে নিশ্চিত করলাম যে পরিবর্তনটা আমলে নিয়েছি। আমি কোলে থাকা মানচিত্রে গভর্নমেন্ট হাউস খুঁজে বের করলাম। তারপর উড়াল দিলাম। আমার দলের অন্য তিন সদস্যকে তখনো এই পরিবর্তন সম্পর্কে বলিনি। ওয়্যারলেসে ঘোষণা দিয়ে সারা দুনিয়াকে আমি খবরটা জানাতে চাইনি। আমার দলের আর তিন সদস্য ছিলেন ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট বিনোদ ভাটিয়া, ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট রাঘবচারি ও ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মালহি।

আকাশপথে ঢাকার কাছাকাছি আসার পর তাঁদের তিনজনকে নতুন লক্ষ্যবস্তুর কথাটা জানালাম। জায়গাটি সম্পর্কে তাঁদের মোটামুটি একটা ধারণা দিয়ে তাঁদের সেটা খুঁজে বের করতে বললাম। জায়গাটি প্রথমে খুঁজে বের করলেন ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট ভাটিয়া। তিনি জানালেন, জায়গাটির অবস্থান ঠিক ৫০০ গজ দূরে, ঘড়ির ১১ নম্বর কাঁটার অভিমুখে। ভবনটি ছিল পুরোনো আমলের প্রাসাদের মতো। দেখতে দারুণ। তার ওপর ছিল বড় একটা গম্বুজ। ভবনটি অবস্থান ছিল ঘন সবুজ একটি মাঠের মাঝখানে। প্রবেশপথের ভেতর দিকে কিছু গাড়িও ছিল।

ভবনটিকে ঘিরে আমি একটা চক্কর কাটলাম। তারপর বিভিন্ন দিক থেকে বড় বৃত্ত তৈরি করে আক্রমণের নির্দেশ দিলাম। আমি গোলা ছুড়লাম গমু¼জের নিচের কক্ষটি নিশানা করে। অন্যরাও নানা জায়গায় গোলা নিক্ষেপ করল। আমরা প্রত্যেকে দুবার উড়ে গিয়ে গভর্নমেন্ট হাউসে ১২৮টি রকেট ছুড়লাম।

দ্বিতীয় আক্রমণের পরপরই পূর্ব পাকিস্তানের সবচেয়ে শক্তিশালী ভবন থেকে ধুলোবালু ও ধোঁয়া দেখা গেল। এ ঘটনা নিশ্চিতভাবেই বেসামরিক প্রশাসনের কোমর ভেঙে দিয়েছিল। এর দুই দিন পরই জেনারেল নিয়াজিকে তাঁর ৯৩ হাজার সেনাসহ ভারতীয় সেনাবাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করতে হয়।

আমি শুনতে পেয়েছি, সে দিন বিকেলেই পাকিস্তান সেনাবাহিনীর শীর্ষ কর্মকর্তারা ভারত সরকারের ঘোষিত নিরাপদ আশ্রয় হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে আশ্রয় নেয়। জেনারেল নিয়াজি কিন্তু আগের দিনও বলেছিলেন, তিনি আরও এক

মাস যুদ্ধ চালিয়ে যেতে পারবেন। এর পর বাস্তবতা মেনে নেওয়া ছাড়া তাঁর হাতে আর কোনো উপায় রইল না। আত্মসমর্পণ করার সিদ্ধান্তটা তাঁকে শেষ পর্যন্ত নিতেই হয়। মানসম্মান পুনরুদ্ধার করার এ ছাড়া আর কোনো উপায় তাঁর হাতে ছিল না। তিনি ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর তিনি আত্মসমর্পণের সিদ্ধান্ত জানান। সে দিন বিকেলেই তা কার্যকর হয়। নামিয়ে দেওয়া হলো পাকিস্তানের পতাকা,   যা আর কোনো দিনই সেখানে উঠবে না। ‘সোনার বাংলা’ তখন বাস্তবে রূপ নিল।’

অনুবাদ:  **প্রতীক বর্ধন**

**গ্রুপ ক্যাপ্টেন বি কে বিষ্ণয়: ভারতের প্রথম সুপারসনিক স্কোয়াড্রনের অধিনায়ক**

# ঢাকায় তিন দিন

আগস্ট মাসে জাতিসংঘ শরণার্থী হাইকমিশনার প্রিন্স সদরুদ্দিন আগা খান আমাকে ঢাকায় পাঠান সেখানকার শরণার্থীদের সম্ভাব্য সমস্যায় তাঁদের সাহায্য সহযোগিতা করার জন্য। জাতিসংঘের সহকারী মহাসচিব জাতিসংঘের ত্রাণ কর্মকাণ্ডের সার্বিক দায়িত্বে ছিলেন পল মার্ক হেনরি, জাঁদরেল ফরাসি ভদ্রলোক। ঢাকায় একটা সংক্ষিপ্ত সফরে এসেছিলেন তিনি ডিসেম্বরে। তখন সহিংসতা শুরু হয়ে গেলে তিনি ঢাকায় আটকা পড়ে যান। তিনি আমাকে সামরিক ও সরকারি কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষার দায়িত্ব দেন। এই লেখাটি শুধু ১৯৭১ সালের ডিসেম্বরে ঢাকার সহিংস ঘটনাবলির শেষ তিনটি দিন নিয়ে লেখা।

**১৪ ডিসেম্বর, মঙ্গলবার**

১৪ ডিসেম্বর সকালে তৎকালীন পূর্ব-পাকিস্তানের গভর্নর ড. এ এম মালিক আমাকে হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে ফোন করেন। হোটেলে আমি ও জাতিসংঘের একজন কর্মকর্তা পিটার হুইলার ছিলাম। ড. মালিক ফোনে আমাকে তাঁর অবস্থা দেখার জন্য গভর্নর্স হাউসে যেতে বলেন। আগে ঢাকায় জাতিসংঘ শরণার্থী হাইকমিশনের প্রতিনিধি হিসেবে এবং যুদ্ধের সময় যখন আমি সামরিক ও সরকারি কর্মকর্তাদের সঙ্গে লিয়াজোঁ করছিলাম তখন অনেকবার ড. মালিকের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়েছে।

আমি ও পিটার হুইলার যখন গভর্নর্স হাউসে ড. মালিকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যাই তখন তিনি একটা ক্যাবিনেট বৈঠকে ছিলেন; কিন্তু তবুও বেরিয়ে এসে আমাদের নিয়ে গেলেন তাঁর এডিসির অফিসে। তাঁর ব্যক্তিগত পরিস্থিতির ব্যাপারে তিনি আমাদের পরামর্শ চাইলেন।

আমি তাঁকে বললাম আমার মনে হয় তাঁর ও তাঁর মন্ত্রীদের সামনে এখন মৃত্যুর বিরাট ও প্রকট ঝুঁকি সৃষ্টি হয়েছে। আমি আরও বললাম যে তাৎক্ষণিকভাবে তিনি যদি হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টাল নিউট্রাল জোনে আশ্রয় না নেন তাহলে হয়তো ওই রাতটার ফাঁড়াই তিনি কাটাতে পারবেন না। তবে নিউট্রাল জোনে প্রবেশের অনুমতি পেতে হলে তাঁদের সব সরকারি দায়িত্ব থেকে ইস্তফা দিতে হতো। তিনি বললেন যে তাঁর মন্ত্রিসভা ওই মুহূর্তে ভাবছেন তাঁরা পদত্যাগ করবেন কি করবেন না, তবে তাঁরা তা করতে অনিচ্ছুকই ছিলেন। তিনি বললেন যে তিনি নিজে মনে করেন ওই মুহূর্তে তাঁর পদত্যাগ করা উচিত হবে না। কারণ তাহলে ইতিহাসের দৃষ্টিতে রণে ভঙ্গ দিয়ে পলায়ন বলে মনে হবে।

সেই মুহূর্তে গভর্নর্স হাউসটি কয়েকটা প্রচণ্ড বিস্ফোরণে ভয়াবহভাবে কেঁপে ওঠল। এটা পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছিল যে ভারতীয় বিমানবাহিনীর আক্রমণের কবলে পড়েছে ভবনটি। আমি ও পিটার হুইলার তক্ষুনি ঝুলবারান্দা টপকে পেরিয়ে বেরিয়ে এলাম এবং গজ পাঁচেক দূরে একটা জিপের নিচে আশ্রয় নিলাম। গোটা ছয়েক ভারতীয় বিমানের প্রত্যেকটা থেকে দুবার করে রকেট ও কামানের আঘাত এসে পড়ল ভবনটির ওপরে। গভর্নর্স হাউসের ওপর হামলা চলছে এরই মধ্যে আমি প্রায় ২০ গজ দৌড়ে চলে এলাম একটা টেঞ্চের কাছে, টেঞ্চটা ততক্ষণে সৈন্যে ভর্তি, আমি উপুড় হয়ে শুয়ে পড়লাম। এই পুরোটা সময় ধরে আমি আমার হাতের ওয়াকিটকিতে আক্রমণটি সম্পর্কে ধারা বর্ণনা চালিয়ে যেতে থাকলাম পল-মার্ক হেনরির উদ্দেশে, যিনি তখন জাতিসংঘের লোকেশনে অবস্থান করছিলেন। জেনারেল ফরমান আলী নিরাপত্তার খোঁজে ছুটছিলেন, ছুটতে ছুটতে তিনি আমাকে বললেন, ভারতীয়রা আমাদের ওপরে এই হামলা করছে কেন? ২০ গজ দূরে গভর্নর্স হাউসের ওপর ভারতীয় বিমানগুলো হামলা চালিয়ে যাচ্ছে রকেট আর কামানের

গোলা নিক্ষেপ করে। এই পরিস্থিতিটা জেনারেল ফরমান আলীর সঙ্গে গল্প করার উপযুক্ত নয় বলে আমার মনে হলো, তিনি তাঁর নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে ছুটতে থাকলেন। আক্রমণের আওয়াজে কানে তালা লেগে যাওয়ার জোগাড়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তারা থামল এবং আমি আমার গাড়িতে উঠে পিটার হুইলারকে তুলে নিয়ে জাতিসংঘের লোকেশনে ফিরে এলাম।

জাতিসংঘ লোকেশনে এসে আমি ঘটনা সম্পর্কে পল-মার্ক হেনরিকে জানালাম এবং *দি অবজারভার*- এর গ্যাভিন ইয়াংয়ের সঙ্গে দেখা করলাম। তিনি গভর্নর্স হাউসে কী ঘটেছে তা দেখতে যাওয়ার প্রস্তাব করলেন। আমি রাজি হলাম এবং আমার গাড়িতে করে তাঁকে নিয়ে গভর্নর্স হাউসে আবার গেলাম। সেখানে সামরিক সচিবের সঙ্গে আমাদের দেখা হলো, তিনি আমাদের জানালেন যে ড. মালিক ও তাঁর মন্ত্রিপরিষদ গভর্নর্স হাউসের বাঁ দিকে একটা বাংকারে আশ্রয় নিয়েছেন। তিনি আমাদের সেখানে নিয়ে গেলেন। তাঁরা তখনো দ্বিধান্বিত পদত্যাগ করবেন কি না তা নিয়ে। আমি তাঁদের বললাম যে আমার মনে হয় তাঁরা কেবল অনিয়মিত সৈন্যদের হাতে নিহত হওয়ার বিপদের সম্মুখীন তাই নয়, তাঁদের নিজেদের রক্ষীদের ওপরও তাঁদের আর নির্ভর করা চলে না, বরং ভারতীয় বিমানবাহিনী নিজেও তাদের জীবনের ওপর প্রত্যক্ষ হামলা করে বসেছে।

সেই মুহূর্তে ভারতীয় বিমানবাহিনী গভর্নর্স হাউসের ওপর দ্বিতীয়বারের মতো বিধ্বংসী হামলা চালাল। বাংকারটি ভূমির ওপরে ছিল বলে সেটা খুব একটা নিরাপদ ছিল না, আর আমরা জানতাম না ভারতীয় বিমানবাহিনী সেটার অস্তিত্বের কথা জানত কি না। একটা সরাসরি আঘাত হলে সেটা নিশ্চিতই উড়ে যাওয়ার কথা। আক্রমণ চলতে থাকল। মন্ত্রীরা তখন পাকিস্তানের প্রেসিডেন্টের উদ্দেশে পদত্যাগপত্র লিখলেন, ড. মালিক সকল মন্ত্রীর উপস্থিতিতে সেটাতে স্বাক্ষর করলেন। সদ্য সাবেক গভর্নর ও সদ্য সাবেক মন্ত্রীরা ওই দিনই একটু পরে হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে নিউট্রাল জোনে ওঠে এলেন।

**১৫ ডিসেম্বর, বুধবার**

১৫ ডিসেম্বর খুব সকাল বেলা ড. মালিক হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে আমার কাছে এসে বললেন যে ১৪ ডিসেম্বর গভর্নর হিসেবে তাঁর পদত্যাগ ও গভর্নর্স হাউস থেকে প্রস্থানের মাঝামাঝি সময়ে তিনি প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার কাছ থেকে একটা টেলিগ্রাম পেয়েছেন। আমি যত দূর জানি, এই প্রথম প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া একটা যুদ্ধবিরতির অনুমোদন দিলেন।

ড. মালিক বললেন, প্রেসিডেন্টের নির্দেশনার ব্যাপারে তিনি জেনারেল নিয়াজির সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারছেন না। ইয়াহিয়ার নির্দেশ: যুদ্ধ বন্ধ করার জন্য সব প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ এখন আপনাকে নিতে হবে। নিয়াজির সঙ্গে যোগাযোগ করার ব্যাপারে ড. মালিক আমার সহযোগিতা চাইলেন। আরও প্রাণহানি ঠেকানোর উদ্দেশ্যে আমি আমার ব্যক্তিগত সামর্থ্য থেকে তাঁকে সহযোগিতা করতে রাজি হলাম। তারপর আমি নিউট্রাল জোনে পাকিস্তান সামরিক লিয়াজোঁ কর্মকর্তা কর্নেল গাফফারের সঙ্গে যোগাযোগ করলাম। তারপর আমরা তিনজন আমার রুমে গেলাম এবং সেখান থেকে জেনারেল নিয়াজিকে ফোন করলাম। ড. মালিক জেনারেল নিয়াজিকে জিজ্ঞেস করলেন, প্রেসিডেন্টের নির্দেশের ব্যাপারে তিনি কী পদক্ষেপ নিয়েছেন। জেনারেল নিয়াজি উত্তরে বললেন যে এ ব্যাপারে তিনি ড. মালিকের সঙ্গে আলোচনা করতে চান। তিনি ড. মালিককে হোটেল ছেড়ে ক্যান্টনমেন্টে যেতে বললেন। আমি ড. মালিককে বললাম, যদি উনি নিউট্রাল জোন ত্যাগ করেন তাহলে তাঁর আর কোনো নিরাপত্তা থাকবে না। আর আগের দিন তাঁর পদত্যাগ ও তাঁর পরবর্তী পরিস্থিতিতে

নিউট্রাল জোন ত্যাগ করা তাঁর জন্য বিপজ্জনকই হবে। আমি উল্টো তাঁকে পরামর্শ দিলাম জেনারেল নিয়াজিকে হোটেলে আসতে বলতে, কিন্তু নিয়াজি জানালেন তিনি তাঁর পক্ষ থেকে জেনারেল ফরমানকে পাঠাচ্ছেন।

জেনারেল ফরমান ঠিক সময়ে উপস্থিত হলেন। আমি একজন বিদেশি, আর যাই হোক না কেন, কোনো মধ্যস্থতাকারী হিসেবে নয়, ব্যক্তিগতভাবে কাজ করছিলাম, তাই তাঁদের অভ্যন্তরীণ বিষয়ের এ রকম একটা আলোচনা থেকে আমি সরে গেলাম। ড. মালিক জেনারেল ফরমান ও কর্নেল গাফফার আলোচনায় বসলেন। পরে তাঁরা আমাকে আবার আমন্ত্রণ জানালেন এবং তাঁদের প্রণীত কতগুলো প্রস্তাব দেখালেন, যা জেনারেল ফরমান জেনারেল নিয়াজির কাছে অনুমোদন আর প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার কাছে পাঠানোর জন্য নিয়ে যাচ্ছিলেন।

প্রস্তাবগুলো এই

আরও প্রাণহানি ও ক্ষয়ক্ষতি বন্ধ করতে আমরা সম্মানজনক শর্তে এই প্রস্তাবগুলো জানাতে ইচ্ছুক:

ক. পূর্ব পাকিস্তানে যুদ্ধবিরতি এবং সকল সহিংসতা তাৎক্ষণিকভাবে বন্ধ।

খ. জাতিসংঘের আয়োজন অনুযায়ী পূর্ব পাকিস্তানের হাতে প্রশাসনের শান্তিপূর্ণ হস্তান্তর;

গ. জাতিসংঘকে নিশ্চিত করতে হবে:

১. সামরিক ও আধাসামরিক বাহিনীগুলোর সকল সশস্ত্র সদস্যের পশ্চিম পাকিস্তান প্রত্যাবর্তনের আগ পর্যন্ত সুরক্ষা ও নিরাপত্তা;

২. পশ্চিম পাকিস্তানি সকল বেসামরিক ব্যক্তি ও সরকারি কর্মকর্তাদের পশ্চিম পাকিস্তানে প্রত্যাবর্তনের আগ পর্যন্ত নিরাপত্তা;

৩. ১৯৪৭ সালের পর পূর্ব পাকিস্তানে বসবাসরত সকল অস্থানীয় ব্যক্তির নিরাপত্তা;

৪. ১৯৭১ সালের মার্চ থেকে যারা পাকিস্তান সরকারের সেবা করেছে এবং পাকিস্তানের স্বার্থে সহযোগিতা করেছে তাদের বিরুদ্ধে কোনো প্রত্যাঘাতমূলক পদক্ষেপ নেওয়া হবে না এই মর্মে নিশ্চয়তা।

জেনারেল ফরমান ওই দিনই পরে আমাদের কাছে ফিরে এসে তাঁদের প্রস্তাবের ব্যাপারে জেনারেল নিয়াজি ও প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার প্রতিক্রিয়া জানাবেন বলে কথা দিয়ে গেলেন। রাত নয়টার দিকে তিনি ফিরে এসে আমাদের জানালেন, জেনারেল নিয়াজি প্রস্তাবগুলো অনুমোদন করলেও ইসলামাবাদ (খ) প্রস্তাবটি, অর্থাৎ 'পূর্ব পাকিস্তানের কাছে প্রশাসন হস্তান্তর' প্রস্তাবটি নাকচ করে দিয়েছে। যুদ্ধবিরতির আরও একটি উদ্যোগ এভাবেই শেষ হলো।

**১৬ ডিসেম্বর, বৃহস্পতিবার**

১৬ ডিসেম্বর খুব সকালে আমরা জানতে পেলাম ভারতীয় সেনাবাহিনী পূর্ব পাকিস্তানে পাকিস্তান সেনাবাহিনীকে ওই দিনই ঢাকার সময় সকাল সাড়ে নয়টার মধ্যে আত্মসমর্পণের আলটিমেটাম দিয়েছে। কর্নেল গাফফার, লিগ অব রেডক্রস সোসাইটিজের সভেন ল্যামপেল ও আমি হোটেল থেকে টেলিফোনে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর সদর দপ্তরে যোগাযোগের জন্য মরিয়া হয়ে চেষ্টা করলাম, কিন্তু আমরা যোগাযোগ করতে পারলাম না। ব্রিটিশ আর্মির পদাতিক বাহিনীর একজন অফিসার হিসেবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে উত্তর আফ্রিকা ও ইউরোপের ফ্রন্টে অংশগ্রহণের অভিজ্ঞতা থেকে আমি বেশ ভালোভাবে জানি ঢাকার ওপর একটা সর্বাত্মক সামরিক আক্রমণ কী মর্মান্তিক প্রাণহানি ও ধ্বংসলীলা ডেকে

আনতে পারে। কর্নেল গাফফার আমাদের বললেন যে আগের দিন ভারতীয় বিমান হামলায় পাকিস্তানি বাহিনীর কম্যুনিকেশন সেন্টার ধ্বংস হয়ে গেছে, আর তিনি নিশ্চিত জানেন না, প্রথমত, জেনারেল নিয়াজি আলটিমেটাম গ্রহণ করবেন কি করবেন না, দ্বিতীয়ত, পাকিস্তানি সেনাবাহিনী আলটিমেটাম গ্রহণ করেছে কি করেনি সেটা তারা ভারতীয় বাহিনীকে জানাতে পেরেছে কি না।

প্রায় সাড়ে আটটার দিকে কর্নেল গাফফার, ল্যামপেল ও আমি ঠিক করলাম, নিউট্রাল জোন থেকে বেরিয়ে গাড়িতে করে ক্যান্টনমেন্টে গিয়ে জেনারেল নিয়াজির কাছ থেকে শুনব কী হচ্ছে, তিনি ভারতীয় বাহিনীর সঙ্গে যোগাযোগ করতে পেরেছেন কি না।

কিছুক্ষণ পরে আমরা কমান্ড বাংকারে পৌঁছালাম, কিন্তু জেনারেল নিয়াজিকে দেখা গেল না। তবে আমরা জেনারেল ফরমানকে বাংকারের ভেতরে পেলাম। আসমানের দিকে চেয়ে তিনি এমন একটা ভাব করলেন যে মনে হলো তিনি সব আশা ছেড়ে দিয়েছেন। তিনি আমাকে জানালেন, তাঁকে পূর্ব পাকিস্তানে সমগ্র পাকিস্তান সেনাবাহিনীর পক্ষে কথা বলার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। তিনি আরও জানালেন, তাঁরা ভারতীয় আলটিমেটাম গ্রহণ করতে রাজি হয়েছেন। তিনি নিশ্চিত করে আরও জানালেন যে কম্যুনিকেশন সেন্টার ধ্বংস হয়ে যাওয়ায় তাঁরা আলটিমেটাম গ্রহণ করেছেন এই তথ্য ভারতীয় বাহিনীকে জানাতে পারেননি।

আমি জেনারেল ফরমানের কাছে জানতে চাইলাম, একটা কম্যুনিকেশন চ্যানেল হিসেবে আমি জাতিসংঘের রেডিও নেটওয়ার্কের মাধ্যমে পাকিস্তান বাহিনীর আলটিমেটাম গ্রহণের খবরটা প্রচার করি তা তিনি চান কি না। জেনারেল ফরমান হ্যাঁ সূচক জবাব দিলেন, আমি তাঁকে বাংকারের বাইরে নিয়ে এলাম যাতে আমার হ্যান্ডসেট রেডিওটি কাজ করতে পারে। আমি জাতিসংঘ লোকেশনে হেনরির সঙ্গে যোগাযোগ করলাম। জেনারেল ফরমানের উপস্থিতিতে আমি হেনরিকে মেসেজটা দিলাম এবং জেনারেল ফরমান আরও দুটি পয়েন্ট যোগ করলেন: এক. পাকিস্তান সেনাবাহিনীর যোগাযোগব্যবস্থা নষ্ট হয়ে যাওয়ায় ভারতীয় বাহিনীর প্রতি যুদ্ধবিরতির সময় আরও ৬ ঘণ্টা বাড়ানোর অনুরোধ, দুই. ভারতীয় সেনাবাহিনীর স্টাফ অফিসারদের একটা দলকে আরও সমঝোতা নিয়ে আলোচনার জন্য সম্ভব হলে হেলিকপ্টারে করে ঢাকা বিমানবন্দরে আসার আমন্ত্রণ, যেখানে তাঁরা নিরাপদ আচরণ ও যথার্থ সৌজন্য লাভ করবেন। আমি পুরো মেসেজটা আমার রেডিওতে ঠিকমতো হেনরিকে জানিয়ে দিলাম, তিনি তৎক্ষণাৎ তা নয়াদিল্লি পাঠালেন। তখন সকাল নয়টা বেজে ২০ মিনিট।

*ঢাকা, ৮ মার্চ ১৯৭২*
অনুবাদ: মশিউল আলম

**জন আর কেলি: জাতিসংঘের শরণার্থীবিষয়ক হাইকমিশনের সাবেক কর্মকর্তা**

# ডিসেম্বরের স্মৃতি

অক্সফামের সমন্বয়কারী হিসেবে ভারতে ছয় লাখ নারী-পুরুষ ও শিশুর জন্য পরিচালিত শরণার্থী ত্রাণ কর্মসূচিতে ১৯৭১ সালের ডিসেম্বরে দায়িত্ব পালন করার সময় বিভিন্ন ব্যাপারে আমি উদ্বিগ্ন ছিলাম। শরণার্থী শিবিরগুলোতে যাওয়ার সড়কপথগুলো ভারতীয় সামরিক যানবাহন ও যন্ত্রপাতিতে অবরুদ্ধ হয়ে পড়েছিল। আর ত্রিপুরা, মেঘালয়, আসাম ও কুচবিহারের মতো দূরের জায়গাগুলোতে ত্রাণ সরবরাহ করা ছিল কঠিন। ব্রিটিশ জনগণ অক্সফামের প্রচার কার্যক্রমে সাড়া দিয়ে হাজার হাজার কম্বল ও উলের কাপড় দান করেছিল। 'আপনার বিছানা থেকে একটি কম্বল তুলে নিয়ে দান করে দিন' এবং 'আপনার শীতের জামাটা আমাদের কাছে পাঠিয়ে দিন, তা কারও জীবন বাঁচাতে পারে'—জনগণের প্রতি এই দুটি আহ্বান জানিয়েছিল অক্সফাম। ব্রিটিশ সংবাদপত্রগুলোতে প্রকাশিত বিজ্ঞাপনে বলা হয়েছিল, 'ভারতে শরণার্থীরা নতুন এক আতঙ্কের মুখোমুখি হয়েছে। শীতকালে রাতের তাপমাত্রা হিমাঙ্কের নিচে নেমে যেতে পারে। শিশু ও বৃদ্ধরা এখনকার ঠান্ডায় মরে যাচ্ছে। পূর্ণবয়স্ক সুস্থ লোকজনও এই শীতে টিকতে পারবে না। জরুরিভিত্তিতে চাই গরম কাপড়চোপড়, শাল, সোয়েটার, কার্ডিগান বা উলের যেকোনো জামাকাপড়।'

অক্সফামের ঠিকানায় পাঠানো কম্বল ও গরম জামাকাপড়ের জন্য ডাকমাশুল ছাড় দিয়ে ব্রিটিশ পোস্ট অফিস এক বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন করে। আমরা এসব গরম কাপড় ও কম্বল দ্রুত পাঠানোর তাগিদ অনুভব করি। কিন্তু ট্রাকে করে সেগুলো বিভিন্ন এলাকায় পৌঁছানো অনেক সময়সাপেক্ষ হয়ে পড়ে। যেমন কলকাতা থেকে আগরতলায় ট্রাক পৌঁছাতে অন্তত ১০ দিন সময় লেগে যেত। তাই আমরা পশ্চিমবঙ্গের উত্তরাংশ এবং কুচবিহারের তৎকালীন মহারাজার বিমানঘাঁটিতে ত্রাণসামগ্রী পাঠানোর জন্য পুরোনো ডাকোটা বিমানের (ডিসি-৩ ও ডিসি-৬) ব্যবস্থা করলাম। জরুরিভিত্তিতে ২৭ টন ত্রাণসামগ্রী সরবরাহের জন্য অক্সফাম যে বিমানটি ভাড়া করেছিল, তা নিয়েও আমি উদ্বিগ্ন ছিলাম। এতে পাঁচ লাখ মার্কিন ডলারের সমপরিমাণ ওষুধ (মার্কিন প্রতিষ্ঠানের দান), ৩০ লাখ পানি বিশুদ্ধকরণ ট্যাবলেট এবং কম্বল ছিল। যুদ্ধের কারণে বিমানটিকে কলকাতায় অবতরণের অনুমতি না দিয়ে মাদ্রাজে (বর্তমান চেন্নাই) পাঠিয়ে দেওয়া হয়। তাই আমাদের কর্মীদের সেখানে গিয়ে এসব ত্রাণসামগ্রীর শুল্ক ছাড় করিয়ে কলকাতায় পাঠানোর ব্যবস্থা করতে হয়েছিল। একই সময়ে আমি ওড়িশায় ত্রাণ পাঠানোর কাজে ব্যস্ত ছিলাম। সেখানে এক মাস আগে শক্তিশালী এক ঘূর্ণিঝড়ে নয় হাজারেরও বেশি মানুষ প্রাণ হারায় এবং বড় ধরনের বিপর্যয় দেখা দেয়। ১৯৭১ সালের নভেম্বর-ডিসেম্বরে, আমি যে বিষয়টা নিয়ে সবচেয়ে বেশি চিন্তিত হয়ে পড়ি, তা ছিল ঠান্ডায় মানুষের মৃত্যু। ক্ষুধার কারণে মৃত্যুর মতোই ঠান্ডায় মারা যাওয়াটাও ছিল একই রকম ভয়ানক। অল্প দিনের শিশু এবং বৃদ্ধরা সবচেয়ে বেশি ঝুঁকির মধ্যে ছিল। নভেম্বরের শেষের দিকে একপর্যায়ে আমরা হিসাব করে দেখি, সবগুলো শরণার্থী শিবিরে প্রতিদিন অন্তত চার হাজার শিশু মারা যাচ্ছে।

নভেম্বরের শেষ পর্যায়ে সীমান্তের বিভিন্ন কেন্দ্রে যখন প্রচুর গোলাবর্ষণ করা হচ্ছিল, আমাকে কিছু জায়গায় ত্রাণ কার্যক্রম বন্ধ করে দিতে হয়। কারণ, আমাদের কর্মী ও স্বেচ্ছাসেবীদের বিপজ্জনক জায়গায় গিয়ে কাজ করতে হচ্ছিল। এসব সিদ্ধান্ত ছিল খুব কঠিন। কারণ, আমরা এমন এক সময়ে শরণার্থীদের পরিত্যাগ করছিলাম যখন তারা একটা যুদ্ধের কথা ভেবে উত্তেজিত। তারা ভাবছিল, বাংলাদেশ সত্যিই একদিন স্বাধীন হবে, আর তারা নিজ দেশে ফিরে যাবে। তাদের সব রকমের আবেগই ছিল খুশি, আনন্দ, আর পাশাপাশি কিছু ভয়। বাড়ি ফিরে গিয়ে তারা কী পাবে? একটি শরণার্থী শিবিরের সংগঠককে আমি জিজ্ঞেস করলাম, দেশে ফিরে যাওয়ার ব্যাপারে তিনি কী ভাবছেন। তিনি আমাকে বললেন, 'আপনারা আমাদের বাঁচিয়ে রাখার জন্য সব ধরনের চেষ্টা করেছেন। কিন্তু জীবন অনেক কঠিন হয়ে পড়েছে। নিজের গ্রামে ফিরে যেতে পারলেই আমার ভালো লাগবে, যদিও বাড়িঘর হয়তো সবই ধ্বংস হয়ে গেছে। তবু নিজের দেশ তো নিজের দেশই। কিন্তু এসব আশ্রয়কেন্দ্রে কাটানো দুর্ভোগের স্মৃতি সব সময়ই মনের মধ্যে রয়ে যাবে। ৫০টি শিশু একটিমাত্র ডিম নিয়ে কাড়াকাড়ি করছে এবং দুধের জন্য সারিবদ্ধ হয়ে অপেক্ষা

করতে করতে কোনো শিশু বমি করছে এবং মারা যাচ্ছে—এসব ঘটনা মনে থেকে যাবে। আমার মনে পড়বে, কীভাবে কাদার মধ্যে একজন অন্তঃসত্ত্বা নারী কাতরাতে কাতরাতে সন্তান প্রসব করছিলেন। আহ্, বাংলাদেশে নিজের বাড়িতে ফিরে যেতে আমাকে আর কতদিন যে অপেক্ষা করতে হবে।'

আমার মূল্যবান দলিলপত্রের সংগ্রহশালা থেকে দেখতে পাই, বিজয় দিবসের এক দিন আগে (১৫ ডিসেম্বর ১৯৭১) আমি কলকাতায় বাংলাদেশের সরকারি কর্মকর্তাদের আহ্বানে একটি সভায় যোগ দিয়েছিলাম। সেখানে বাংলাদেশের ভবিষ্যতের সম্ভাব্য বিভিন্ন চাহিদা নিয়ে আলোচনা হয়েছিল। অক্সফামে আমি সেদিন যে তারবার্তা (টেলেক্স) পাঠিয়েছিলাম, তাতে লেখা ছিল: বাংলাদেশ সরকার আশা করে, ভারতে অবস্থানরত শরণার্থীদের অধিকাংশই জানুয়ারির শেষ নাগাদ ফিরে যাবে। এই এক কোটি মানুষের পাশাপাশি আরও আনুমানিক দুই কোটি মানুষ বাংলাদেশে উদ্বাস্তু হয়েছে। এসব মানুষের জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্যশস্যের আনুমানিক চাহিদা প্রতি মাসে পাঁচ লাখ টন। জরুরি যানবাহনের চাহিদা রয়েছে এক হাজার ট্রাক এবং ৫০০টি বাসের। আশ্রয়কেন্দ্র তৈরির কাজে সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত বাঁশ-জাতীয় উপকরণগুলো পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ধ্বংস করে দিয়েছে বলে খবর পাওয়া গেছে।

১৯৭১ সালের অত্যন্ত দুঃখজনক ও বেদনাদায়ক অনেক স্মৃতি আছে আমার। আর অবশ্যই ১৯৭১ সালের ডিসেম্বরের স্মৃতিগুলো এখনো আমার মনে খুব স্পষ্টভাবে শেকড় গেঁথে রয়েছে। পাকিস্তানি বাহিনীর আত্মসমর্পণের খবরটা আমরা যখন শুনলাম, আমার ৩৬ জন সহকর্মীর মধ্যে একই সঙ্গে স্বস্তি ও আনন্দ দেখা গিয়েছিল। তাঁদের অধিকাংশই সীমান্তের ওপর থেকে এসেছিলেন শরণার্থী হিসেবে। একটি দল হিসেবে আমরা দিনে প্রায় ১৮ ঘণ্টা কাজ করতাম। তাই যখন শুনলাম, যুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে, অনেকের নিঃশেষিত ক্লান্তি এবং আনন্দের অশ্রু ঝরল। আত্মসমর্পণের খবরটা শোনামাত্র আমি সহকর্মীদের এক দিনের ছুটি দিয়ে দিলাম। অনেক মিষ্টি বিতরণ করা হলো। আশপাশে অনেক গান শোনা গেল।

বিজয় দিবসের বিশেষ ছুটির দিনটায় আমি দপ্তরে গিয়ে একা একা বসে গভীর ভাবনায় ডুবে গেলাম। মনে পড়ল তুমুল ত্রস্ততায় ভরা গত কয়েকটি মাসের কথা। সেই দিনগুলোর সমাপ্তির মধ্য দিয়েই তো বাংলাদেশের জন্ম হয়েছে। ১৯৭১ সালের ডিসেম্বরে পার্ক সার্কাসের দপ্তরে একা একা বসে আমি বুঝতে পারছিলাম, যে শিশুদের ত্বক ভাঁজ খেয়ে ও ঢিলে হয়ে ছোট ছোট হাড়ের ওপর ঝুলে পড়েছিল, তাদের কথা আমি কখনোই ভুলে যেতে পারব না। মাথাটা তোলার শক্তি পর্যন্ত তাদের ছিল না। অনেক শিশুর পা ফুলে গিয়েছিল। অনেকে মায়ের কোলে অপুষ্টিতে নিস্তেজ হয়ে পড়েছিল। ভিটামিনের অভাবে অনেক শিশু অন্ধ হয়ে গিয়েছিল। কারও কারও সারা শরীরে এমন ঘা হয়েছিল, যা সেরে ওঠার নয়। তাদের মা-বাবার চোখে আমি দেখেছি সন্তানের আর কখনোই সুস্থ না হওয়ার হতাশা। দেখেছি সেই সব শিশুর মরদেহ, যে আগের রাতেই মারা গিয়েছিল।

অনুবাদ: **আশিস আচার্য**

**জুলিয়ান ফ্রান্সিস: ১৯৭১ সালে বাংলাদেশি শরণার্থীদের জন্য অক্সফামের ত্রাণ কর্মসূচির সমন্বয়কারী**

# মুজিবনগর সরকারের শেষের কয়েকটি দিন

মুজিবনগর সরকার সৃষ্টির আগে থেকেই আমরা কয়েকজন মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষে কাজ করা শুরু করি। আমি তখন হবিগঞ্জের এসডিও। ২৬ মার্চ সকাল থেকে কার্যত হবিগঞ্জ অঞ্চল মুক্ত-স্বাধীন হয়ে পড়ে। তখনো মুজিবনগর সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়নি, অথচ মুক্তিবাহিনী গড়ে তোলার জন্য প্রশাসনিক সমর্থনের প্রয়োজন ছিল। উপরন্তু আইনশৃঙ্খলা রক্ষা, শরণার্থীদের সহায়তা প্রদান ও সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন-ভাতা প্রদান—এসব বিষয়ে আমরা গঠনোন্মুখ বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে আদেশ প্রদান করি। মুজিবনগর সরকার গঠিত হওয়ার পরও প্রায় তিন সপ্তাহ হবিগঞ্জে বাংলাদেশ সরকারের প্রশাসন চালু ছিল। এরপর যখন হানাদার বাহিনী এই অঞ্চল দখল করে নেয়, তখন আমি ও আমার সহকর্মী কাজী রকিবউদ্দীন আহমদ (তৎকালীন ব্রাহ্মণবাড়িয়ার এসডিও ও বর্তমানে প্রধান নির্বাচন কমিশনার) আমরা একসঙ্গে তৎকালীন পূর্বাঞ্চলীয় প্রশাসন ব্যবস্থায় যোগ দিই। এরপর জুলাই-আগস্টের দিকে আমি কলকাতায় মুজিবনগর সরকারে যোগ দিই।

সাধারণ মানুষের প্রত্যাশা ছিল, ভারতের হস্তক্ষেপে পাকিস্তানি বাহিনীকে বর্ষাকালে সহজেই হটিয়ে দেওয়া যাবে। কিন্তু বাস্তবতা দেখা গেল ভিন্ন। বর্ষাকালে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী জেঁকে বসল চারদিক। সাধারণ মানুষ না জানলেও আমরা জানতাম, মুক্তিযোদ্ধারা ও ভারতীয় বাহিনী উভয়েই ভেতরে ভেতরে এ সময় যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছে। নভেম্বর মাসে ভারত-চীন সীমান্তে যখন ঠান্ডা পড়ার ফলে প্রতিকূল পরিবেশ সৃষ্টি হয়, তখন থেকেই বেড়ে চলল ভারতীয় বাহিনীর তৎপরতা। নভেম্বরের শেষ দিকে আমাকে মুজিবনগর সরকার থেকে জানানো হয়, শিলং অঞ্চলে মুক্তিবাহিনী বাংলাদেশি শরণার্থী ও ভারতীয় বাহিনীর মধ্যে সুষ্ঠু সমন্বয়ের জন্য একজন সরকারি কর্মকর্তার উপস্থিতি প্রয়োজন। সে অনুযায়ী ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে আমি শিলং যেতে প্রস্তুতি নিই। ৪ ডিসেম্বর আমার শিলং যাওয়ার কথা ছিল। তবে তার আগেই ৩ ডিসেম্বর রাতে মুক্তিবাহিনী ও ভারতীয় বাহিনীর সঙ্গে পাকিস্তানিদের আনুষ্ঠানিক যুদ্ধ শুরু হয়। এর ফলে আমার আর শিলং যাওয়া হয়নি।

যুদ্ধের সময় আমাদের অফিস ছিল কলকাতার ৮ নম্বর থিয়েটার রোডে। এ সময় আমরা অফিসে যেতাম বটে, কিন্তু বেশির ভাগ সময় ব্যস্ত থাকতাম যুদ্ধের সংবাদ শোনার জন্য। যুদ্ধের প্রথম থেকেই মুক্তিবাহিনী ও ভারতীয় বাহিনী অসাধারণ সাফল্য অর্জন করে। পাকিস্তানি বাহিনীর আগের হাবভাব দেখে মনে হচ্ছিল, তারা লড়াই করবে। তবে বাস্তবে যখন যুদ্ধ শুরু হলো, পাকিস্তানিরা তখন পালাতে শুরু করল। অপ্রত্যাশিতভাবে ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহেই যশোর সেনানিবাস যৌথ বাহিনীর নিয়ন্ত্রণে চলে এল। মুজিবনগর সরকার অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে আমাদের সহকর্মী ওয়ালিউল ইসলামকে (বর্তমানে অবসরপ্রাপ্ত সচিব) যশোরের ডেপুটি কমিশনার হিসেবে পদস্থ করেন। তখনো সাবেক পূর্ব পাকিস্তানে চলছে যুদ্ধ। ওয়ালিউল ইসলাম বাংলাদেশ সরকারের প্রথম ডেপুটি কমিশনার হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। যখনই কোনো ভূখণ্ড শত্রুমুক্ত হচ্ছিল, তখনই সরকার ডেপুটি কমিশনার পাঠাচ্ছিল। আমরা মুজিবনগরে একসঙ্গে মিলেমিশে বন্ধুবান্ধবেরা কাজ করছিলাম। দেখা গেল, দেশ স্বাধীন হওয়ার আগেই বিভিন্ন স্থানে দায়িত্ব নিয়ে অনেককে চলে যেতে হচ্ছে।

সময় যতই এগোতে থাকে, ততই বিজয়ের সংবাদের সঙ্গে সঙ্গে দুর্ভাগ্যজনক সংবাদও আসতে থাকে। পশ্চাদপসরণরত পাকিস্তানিরা নির্মমভাবে নিরীহ বুদ্ধিজীবী ও সরকারি কর্মচারীদের হত্যা করা শুরু করে। প্রথমে খবর আসে মফস্বল থেকে যে এ ধরনের নিধন চলছে। কিন্তু এ সম্পর্কে সম্যক ধারণা পেতে আমাদের সময় লেগেছে। ১৬ ডিসেম্বর পাকিস্তানি বাহিনীর আত্মসমর্পণের পর আলবদর বাহিনীর নৃশংস ক্রিয়াকলাপ আমরা জানতে পারি।

যুদ্ধের সময় আমাদের শঙ্কা ছিল আরও দুটি। একটি শঙ্কা ছিল, পাকিস্তানের 'মুরব্বি'রা কেউ হস্তক্ষেপ করে কি না। এক মুরব্বি ছিল চীন। চীন যদিও হইচই করছিল, কিন্তু শীতকালে তার সামরিক হস্তক্ষেপের ক্ষমতা ছিল সীমিত। মূল চিন্তার কারণ ছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। নিক্সনের নেতৃত্বে যুক্তরাষ্ট্রের সরকার অবস্থান নিয়েছিল পাকিস্তানের পক্ষে। এরা যে কেবল কূটনৈতিক তৎপরতা চালাচ্ছিল তা-ই নয়, সামরিক পেশিশক্তিও প্রদর্শন করছিল। শেষ মুহূর্তে মার্কিন

নৌবহর বঙ্গোপসাগরে যুদ্ধজাহাজও পাঠিয়েছিল। এই পরিস্থিতিতে আমরা শুধু যুদ্ধের সংবাদ নিয়েই ব্যস্ত ছিলাম না, একই সঙ্গে উদ্বিগ্ন ছিলাম পাকিস্তানি মুরব্বিদের ক্রিয়াকলাপ নিয়েও।

দ্বিতীয় শঙ্কার কারণ ছিল ঢাকা দখল নিয়ে। যুদ্ধের আগে পাকিস্তানি বাহিনী ছড়িয়ে ছিল সারা দেশে। অনুমান করা হচ্ছিল, সর্বত্র এরা যৌথ বাহিনীকে প্রতিরোধের চেষ্টা করবে। যুদ্ধের শুরুতেই পাকিস্তানি বাহিনী এ কৌশল পরিবর্তন করে। অল্প কয়েকটি অবস্থান ছাড়া এরা সম্মুখভাগ থেকে সেনা প্রত্যাহার করে তাদের নিয়ে আসে ঢাকার দিকে। এতে অনেক সামরিক বিশেষজ্ঞ মনে করেন, ঢাকা শহরে পাকিস্তানি বাহিনী কেন্দ্রীভূত করে একটি দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছে। এ ধরনের বিশ্লেষণে আমরা সবাই ঘাবড়ে যাই। কারণ, আমাদের অনেকের আত্মীয়স্বজনই তখন ঢাকায় অবস্থান করছিল। তাই সেখানে প্রচণ্ড যুদ্ধ হলে পাকিস্তানি বাহিনী যেমন ক্ষতিগ্রস্ত হতো, এর চেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হতো ঢাকায় অবস্থানরত আমাদের স্বজনেরা। আমাদের পরম সৌভাগ্য, শেষ পর্যন্ত পাকিস্তানিদের পক্ষে ঢাকা রক্ষার জন্য যুদ্ধ করা সম্ভব হয়নি। একসময় যারা হুংকার ছেড়েছিল, ‘বিনা যুদ্ধে নাহি দিব সূচ্যগ্র মেদিনী’, তারা প্রায় সমগ্র দেশই ছেড়ে দিতে বাধ্য হলো বিনা যুদ্ধে।

১৬ ডিসেম্বর অর্জিত হলো কাঙ্ক্ষিত বিজয়। মুজিবনগর সরকার যে উদ্দেশ্যে গঠিত হয়েছিল, সাধিত হলো সেই উদ্দেশ্য। তখন আমরা সবাই ব্যগ্র ঘরে ফেরার জন্য। হ্যাঁ, ঘরে আমরা ফিরে এলাম ঠিকই; কিন্তু যে দেশে ফিরে এলাম, সে দেশের চারদিকে ধ্বংসলীলার স্তূপ। বর্বর বাহিনীর পৈশাচিক হামলায় হারিয়ে গেছে অনেক আত্মীয়-পরিজন। কাজেই আমাদের সামনে তখন যে চ্যালেঞ্জ, সেটা মুক্তিযুদ্ধের চেয়েও বড়। সেই চ্যালেঞ্জ ছিল যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশকে সোনার বাংলায় রূপান্তরিত করা।

**আকবর আলি খান: মুজিবনগর সরকারের কর্মকর্তা; সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা**

# পরাজয়ের দিনগুলো

**৩ ডিসেম্বর, শুক্রবার**
সন্ধ্যায় শুনতে পেলাম, বিমান ও গোলন্দাজ বাহিনীর সহায়তায় ভারতের অগ্রবর্তী বাহিনী গোটা পশ্চিম পাকিস্তানে দ্বিতীয় রণক্ষেত্র চালু করেছে। আমাদের বিমানবাহিনী শ্রীনগর থেকে রাজস্থান ও আগ্রা পর্যন্ত নয়টি বিমানঘাঁটিতে হামলা চালিয়ে জবাব দিয়েছে। আমি মনে করি, শত্রুদের রাডার ও রাশিয়ার এসএএম (ভূমি থেকে আকাশে নিক্ষেপযোগ্য ক্ষেপণাস্ত্র) ফাঁকি দিয়ে চালানো এই হামলা কৃতিত্বের দাবি রাখে। কেন যেন মনে হয়, ভারতীয়রা এ ব্যাপারে অসতর্ক ছিল। এত তাড়াতাড়ি তাদের ওপর এমন শক্তিশালী হামলা চালানো হতে পারে, ঘুণাক্ষরেও তারা আশঙ্কা করেনি।
গত রাতে কয়েক দফায় বিমান হামলার আগাম সংকেত দেওয়া হয়েছিল। নিশ্চয়ই বিমান তৎপরতা ব্যাপকভাবে বেড়ে গেছে। প্রথমবার সতর্কসংকেত শোনার পর আমার ছোট্ট মেয়ে তানিয়ার ঘুম ভেঙে যায়। সে চিৎকার করে সবাইকে নিরাপদ আশ্রয় নিতে বলে।

**৬ ডিসেম্বর, সোমবার**
নিরাপত্তা পরিষদে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব উত্থাপন করা হয়। কিন্তু রাশিয়ার বাধার মুখে তাদের উদ্যোগ বিফল হয়। তারা সব ধরনের যুক্তি ভেটোতে প্রয়োগ করে।

**৭ ডিসেম্বর, মঙ্গলবার**
মনে হচ্ছে, মার্কিননীতি পাকিস্তানের দিকে মোড় নিয়েছে। তারা ভারতকে আগ্রাসনকারী আখ্যা দিয়ে নিন্দা জানিয়েছে এবং সব ধরনের উন্নয়ন সহযোগিতা বন্ধ করে দিয়েছে। এটি আমাদের জন্য কিছুটা হলেও সাফল্যের। এতে হয়তো ভারত তার সেনাদের স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করতে পারে। কারণ, দেশটি দীর্ঘমেয়াদি যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার অবস্থায় নেই, অবশ্য পাকিস্তানের অবস্থাও তা-ই। আমরা উভয়েই নেতিবাচক প্রচেষ্টার মাধ্যমে নিজেদের ধ্বংস করছি। আমরা আর কী করতে পারি? ভারত তো কোনো যুক্তি মানবে না।
বাংলাদেশ সরকারকে স্বীকৃতি দিয়েছে ভারত। এর ফলে, ভারতের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করেছে পাকিস্তান। এ পদক্ষেপে বড় ধরনের কোনো অসুবিধা হবে না। যদিও ভারত সম্পর্কে যে ধরনের গোয়েন্দা তথ্য এর আগে আমরা পেতাম, তা পাব না।

**৮ ডিসেম্বর, বুধবার**
নূরুল আমীন ও ভুট্টোকে যথাক্রমে প্রধানমন্ত্রী ও উপপ্রধানমন্ত্রী এবং পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। আশা করি, এটি পাকিস্তানের জন্য সবচেয়ে কালো দিবস হিসেবে প্রমাণিত হবে না। কারণ, ভুট্টো লোকটা অবর্ণনীয় সমস্যা সৃষ্টি করতে ওস্তাদ। লস যত দিন বেঁচে থাকবে আর এ দেশে থাকবে, তত দিন কোনো শান্তি আসবে না। নূরুল আমীন, এমনকি ইয়াহিয়া খানও তাঁকে নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা রাখেন না। পাকিস্তানের প্রতিনিধিত্ব করতে ভুট্টোকে পাঠানো হয়েছে জাতিসংঘে। তিনি হয়তো দেশের প্রতিনিধিত্ব করবেন, কিন্তু তাঁর চেষ্টা থাকবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার।
পূর্ব পাকিস্তান থেকে আসা খবর খুব একটা ভালো নয়। অনেক এলাকায় আমাদের সেনারা পিছু হটতে বাধ্য হয়েছে,

যদিও তারা বীরবিক্রমে যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে।
পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যে অস্ত্রবিরতি এবং নিজ নিজ ভূখণ্ডে সেনা প্রত্যাহারের আহ্বান জানিয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠ মতামতের ভিত্তিতে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ একটি প্রস্তাব পাস করেছে। এতে কী ধরনের প্রভাব পড়ে তা দেখার বিষয়। সম্ভবত খুব একটা কাজে দেবে না। কারণ, ভারত কোনো যুক্তি শোনার মেজাজে নেই।

**১০ ডিসেম্বর, শুক্রবার**

নূরুল আমীনের নিয়োগ কৃত্রিম ঠেকছে। তিনি কার প্রতিনিধিত্ব করবেন? আমি মনে করি না তিনি পূর্ববঙ্গে গিয়ে সুবিধা করতে পারবেন, ইয়াহিয়া ও ভুট্টোরও সেই ক্ষমতা নেই। তিনি যতই সুশাসক হোন না কেন, এত দিনে অনেক বুড়ো হয়ে গেছেন, ৭৪ বছর বয়স। ইতিবাচক কোনো অবদান রাখার মতো বয়স তাঁর আর নেই। আমার বিশ্বাস, পূর্ববঙ্গে আর টিকতে পারবেন না জানার পরই তিনি ও তাঁর আত্মীয়স্বজন সে জায়গা ছেড়েছেন।
পূর্ব পাকিস্তানে আমাদের সেনারা বীরদর্পে যুদ্ধ করছে; কিন্তু সংখ্যায় তারা খুব কম, অস্ত্রশস্ত্রও খুব বেশি নেই। এ ছাড়া তারা ভারতীয় নৌবাহিনীর অবরোধের মুখে পড়েছে। এর মানে সেখানে সামরিক শক্তিবৃদ্ধি কিংবা ক্ষয়ে যাওয়া শক্তি পূরণ সম্ভব নয়। আক্ষরিক অর্থে সেনাবাহিনীর পিঠ দেয়ালে ঠেকে গেছে, আর তাদের সামনে শত্রুভাবাপন্ন বিশাল জনগোষ্ঠী। এই পরিস্থিতিতেই তাদের লড়াই করতে হচ্ছে। আমাকে বলা হয়েছে, ভারতীয় আগ্রাসন সত্ত্বেও বাঙালিদের আচরণে কোনো পরিবর্তন আসেনি।

**১২ ডিসেম্বর, রোববার**

দুই দিন ধরে বিভিন্ন গণমাধ্যমে জোর দিয়ে তুলে ধরার চেষ্টা চলছে যে পূর্ব পাকিস্তানে আমাদের অপেক্ষাকৃত কমসংখ্যক সেনা কী প্রবল শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে। শত্রুপক্ষের লোকবল ও অস্ত্রশস্ত্র অনেক বেশি। এ ছাড়া, সেনা অবতরণের কাজে এখন হেলিকপ্টার ব্যবহার করা হচ্ছে। ঢাকার মাত্র ৬০ মাইল উত্তরে একদল প্যারা ব্রিগেড নামানো হয়েছে।
অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে, তারা সবচেয়ে ভয়ানক, বেদনাময় ও হৃদয়বিদারক কিছুর জন্য জনগণকে প্রস্তুত করছে। ভারতের সঙ্গে গোপন কোনো চুক্তির কারণেই হয়তো এসব কিছু করা হচ্ছে। অবাঙালি, পশ্চিম পাকিস্তানি ও বিশেষ করে পাঞ্জাবিদের বিরুদ্ধে ঘৃণা এখন তিক্ত ফলে পরিণত হতে যাচ্ছে। তাদের দুর্ভাগ্য যে তারা শত্রু-মিত্রের পার্থক্য বুঝতে পারে না। এই ত্রুটির জন্য শত বছর ধরে তাদের মূল্য দিতে হবে।
এর মধ্যে, দেশটির অবস্থা আরও জটিল হয়ে উঠবে। সম্ভবত মেরামতের বাইরে চলে যাবে।

**১৩ ডিসেম্বর, সোমবার**

প্রেসিডেন্ট নিক্সন যুদ্ধবিরতির আহ্বান জানিয়ে ইন্দিরা গান্ধীকে হয়তো কঠিন ভাষায় চিঠি পাঠিয়েছেন। এমন ইঙ্গিতও মিলছে, সেন্টো আর সিয়াটো চুক্তির বাধ্যবাধকতা অনুযায়ী তারা এমনকি হস্তক্ষেপ করতে পারে। কেউ কেউ বলছেন, পাকিস্তানকে কীভাবে সহযোগিতা দেওয়া যায়, এ বিষয়ে চীন ও যুক্তরাষ্ট্র পরস্পরের সঙ্গে আলোচনা করছে। এদিকে এরই মধ্যে রাশিয়ার একটি শীর্ষ প্রতিনিধিদল নয়াদিল্লি এবং ভারতের অন্য একটি দল মস্কো গেছে। সেই সঙ্গে, পূর্ব পাকিস্তানে ভারত যে গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে, তাতে রাশিয়া নাখোশ। রাশিয়া চায় ঢাকা দখল করা হোক এবং ১৫ তারিখের মধ্যেই যেন সেখানে বাংলাদেশ সরকার অধিষ্ঠিত হয়। যাতে নিরাপত্তা পরিষদে তাদের আবার ভেটো দিতে না হয়।

**১৪ ডিসেম্বর, মঙ্গলবার**

যুদ্ধবিরতির দাবিতে নিরাপত্তা পরিষদে যুক্তরাষ্ট্রের প্রস্তাবে আবার ভেটো দিয়েছে রাশিয়া। আমার আশঙ্কা, এর পর যুক্তরাষ্ট্র ঠান্ডা হয়ে যাবে। যদি তাদের ফ্লিট (সপ্তম নৌবহর) বঙ্গোপসাগরের দিকে অগ্রসর হতে থাকেও, তারও ব্যবহার করা হবে না। ভারতেরও একই হিসাব। তারা ভাবছে, যুক্তরাষ্ট্র শুধু ক্ষোভ প্রকাশ করছে। আমিও তাদের

মতের পক্ষে। ভারতীয়রা এখন বেপরোয়া হয়ে উঠছে। আজাদ কাশ্মীর বা পশ্চিম পাকিস্তানে হামলা চালানোর উদ্দেশ্য তাদের আছে কি না, যুক্তরাষ্ট্রের এমন প্রশ্নের জবাব ভারত দেয়নি।

গত কয়েকটি দিন ছিল সবচেয়ে হতাশাপূর্ণ। পূর্ব পাকিস্তানের খবর খারাপ। শত্রুরা সেখানে সবকটি গুরুত্বপূর্ণ শহরের চৌহদ্দিতে আক্রমণ চালাচ্ছে। ঢাকা থেকে প্রায় ৪০ মাইল উত্তরে টাঙ্গাইলে প্যারাস্যুট ব্রিগেড নামানো হয়েছে। এ ছাড়া পুব দিক থেকে হেলিকপ্টারবাহী ব্রিগেড ও অন্য একটি দল ঢাকার দিকে অগ্রসর হচ্ছে বলে গুজব শোনা যাচ্ছে। শত্রুদের বিমান থেকে সামরিক ও বেসামরিক নির্বিচারে সব ধরনের লক্ষ্যবস্তুতে হামলা চালানো হচ্ছে। এক হামলায় গভর্নমেন্ট হাউসে আগুন ধরে গেছে।

রেডিও ও গণমাধ্যমের খবরে আমাদের আশ্বস্ত করা হচ্ছে যে শত্রুদের দৃঢ়তার সঙ্গে ঠেকানো হয়েছে। কিন্তু ব্রিটিশ সূত্রগুলো বলছে, ঢাকার চারিদিকে শত্রুরা শক্ত অবস্থান নিয়েছে, ঢাকার উপকণ্ঠে তুমুল লড়াই চলছে। তারা টেলিফোনে এ তথ্য সংগ্রহ করতে সমর্থ হয়েছে এবং বন্দুক ও অন্যান্য আগ্নেয়াস্ত্রের শব্দ শোনার দাবি করেছে।

**১৫ ডিসেম্বর, বুধবার**

সিঙ্গাপুর থেকে পাঠানো এক সংবাদে বলা হয়েছে, মার্কিন সপ্তম নৌবহর মালাক্কা প্রণালি পার হয়ে বঙ্গোপসাগরের দিকে এগোচ্ছে। পরের খবরে নিশ্চিত করা হয়েছে, নৌবহরটি সম্ভবত চট্টগ্রামের দিকে যাবে। তাদের উদ্দেশ্য কী বোঝা গেল না। এই বাহিনীর যথেষ্ট ক্ষমতা আছে। কিন্তু পূর্ববঙ্গের পরিস্থিতি পাল্টে দেওয়ার উদ্দেশে তা প্রয়োগ করা হবে কি না সন্দেহ করি।

দুপুরের সংবাদে ঢাকার আশপাশের ভয়ানক পরিস্থিতির ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। সন্ধ্যার খবরে স্পষ্ট করে বলা হয়, ঢাকার চারপাশে সব দিক থেকে যুদ্ধ চলছে এবং বৃত্ত ছোট করে আনা হচ্ছে। শত্রুপক্ষের বহু সেনাদল তাতে যোগ দিয়েছে।

এ বড় মর্মান্তিক খবর। মনে হচ্ছে, পূর্ব পাকিস্তানের পতন শুরু হয়ে গেছে। কিন্তু কিছু বোকা সংকীর্ণ আবেগে অন্ধ মানুষ পরিণাম অনুধাবন না করেই এই কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হয়েছিল। তারা যদি বিভাজন চাইত, তাহলে সহজে শান্তিপূর্ণ উপায়েই তা করতে পারত।

**১৬ ডিসেম্বর, বৃহস্পতিবার**

এই মাত্র খবর পেলাম নিয়াজি পূর্ব পাকিস্তানে আত্মসমর্পণ করেছেন এবং যুদ্ধ থেমে গেছে। ভারতের সেনারা ঢাকায় কুচকাওয়াজ করছে। ঢাকা দুর্বল করতে মর্টার ও অন্যান্য অস্ত্র নিয়ে মুক্তিবাহিনী সক্রিয় ভূমিকা পালন করে। তারা জাতীয়তাবাদী ও জামায়াতে ইসলামী ধরনের ব্যক্তিদের হত্যা করছে।

ভারত ঘোষণা দিয়েছে, বাংলাদেশ স্বাধীন হয়ে গেছে। দেশটির সরকার আজই শপথ নেবে। ইন্দিরা গান্ধী ঘোষণা দিয়েছেন, যেহেতু তাঁদের লক্ষ্য পূরণ হয়েছে, তাই আগামীকাল সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা থেকে তারা এক তরফা অস্ত্রবিরতি পালন করবে।

বেদনাময় হলেও বাংলার এই বিভাজন ছিল অনিবার্য। তা এড়ানো সম্ভব ছিল না। পূর্ববঙ্গের বেশির ভাগ মানুষকে পশ্চিম পাকস্তানিদের শত্রু বলে বোঝানো হয়েছে, আমাদের শাসকদের সময়মতো এ সত্য অনুধাবন করা উচিত ছিল। ভারতের হস্তক্ষেপ শুরুর আগেই বাঙালিদের শান্তিপূর্ণ উপায়ে যেতে দেওয়া উচিত ছিল।

**ডায়রিস অব ফিল্ড মার্শাল মোহাম্মদ আইয়ুব খান ১৯৬৬-১৯৭২ বই থেকে মিজান মল্লিকের অনুবাদ**

**ফিল্ড মার্শাল মোহাম্মদ আইয়ুব খান: পাকিস্তানের সাবেক সামরিক শাসক**

# চূড়ান্ত লজ্জা

১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১। সূর্য ওঠার ঠিক পরের মুহূর্ত। দ্রুত দেখে নিলাম নিজের নতুন প্রতিরক্ষামূলক অবস্থান। আমরা বেশ সুসংগঠিত, কিন্তু শত্রুপক্ষের জোরালো আক্রমণ প্রতিরোধ করার মতো যথেষ্ট শক্তিশালী নই। প্রস্তুতি নেওয়ার জন্য আমাদের সময় দরকার।

খড়ের তৈরি একটি কুঁড়েঘরে স্থাপিত কমান্ড পোস্টে ঢোকার পর ব্রিগেড কমান্ডার ব্রিগেডিয়ার মোহাম্মদ শাফির কাছ থেকে আমি একটি টেলিফোন পাই। কোনো ভূমিকা বা অপ্রয়োজনীয় আলাপ না করে তিনি সরাসরি জানালেন, পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ডের প্রধান জেনারেল এ এ কে নিয়াজি শত্রুপক্ষের সঙ্গে 'আপস করতে রাজি হয়েছেন।' শত্রুতার অবসান ঘটানোর আয়োজন চলছে, আর তাতে অস্ত্র সমর্পণের ব্যাপার রয়েছে। বিস্তারিত জানতে আমি যেন সাদা পতাকা তুলে সমমর্যাদার ভারতীয় বাহিনীর কর্মকর্তার সঙ্গে যোগাযোগ করি।

অবিশ্বাস্য। নিজেদের এমন পরিস্থিতি আমাকে সম্পূর্ণ গ্রাস করে ফেলল। আগে কেউ ব্যাপারটি আমাকে জানাননি। সোজা কথায়, নতুন এই ঘটনাপ্রবাহ আমি বুঝতে পারছিলাম না। এটা নৈতিকভাবে ভুল ও কৌশলগতভাবে অপ্রয়োজনীয়। শত্রুতার ইতি টানার প্রস্তাবের আকস্মিকতা আমাকে এতটাই হতবাক করল যে এর সত্যতা নিয়ে আমার সংশয় হলো। তাই খবরটির উৎস ও প্রেরকের পরিচয় সম্পর্কে ব্রিগেড কমান্ডারকে প্রশ্ন করলাম।

আত্মসমর্পণ করার নির্দেশ ছিল বিনা মেঘে বজ্রপাতের মতো। হঠাৎ ব্যাপারটা এমন হয়ে গেল যে আমাদের রক্ষা করার মতো কোনো দেশ নেই, অর্জন করার মতো কোনো লক্ষ্য নেই, সম্পন্ন করার মতো কোনো অভিযান নেই। নিঃশর্ত আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়ে আমরা কোনো উদ্দেশ্যপূর্ণ উপায়ে প্রতিরোধ গড়ে তোলার নিজস্ব অধিকার হারালাম।

ব্রিগেড সদর দপ্তর থেকে একটি ডাক পেয়ে আমার ঘোর কাটল। অবিলম্বে সৈয়দপুর সেনানিবাসের দিকে পিছু হটার জন্য আমাদের নির্দেশ দেওয়া হলো। শত্রুপক্ষের সঙ্গে কোনো ধরনের যোগাযোগ না হওয়ায় সাদা পতাকা দেখানোর লজ্জা থেকে অন্তত রক্ষা পেলাম।

লজ্জায় মাথা নত করে আমরা সৈয়দপুরে ফিরলাম। পূর্ব পাকিস্তানে নিজ কমান্ডে যোগ দেওয়ার পর এই প্রথমবার আমি সম্পূর্ণ ভেঙে পড়লাম। মন ছিল বিপর্যস্ত। নিজেকে অপরাধী মনে হলো। পদমর্যাদা ও দায়িত্বের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আমি এই 'আত্মসুরক্ষার' পক্ষে কী যুক্তি দেখাব? যারা সর্বোচ্চ আত্মত্যাগ করল, যুদ্ধক্ষেত্রের কঠিনতম পরিবেশেও অনড়ভাবে দায়িত্বের চেয়েও বেশি কিছু করে দেখাল, তাদের কাছে আমার জবাব কী হবে?

ব্যক্তিগতভাবে সিদ্ধান্ত নিলাম, দুর্ভাগ্যজনক পরিস্থিতি সম্পর্কে সেনাদের সামনে বক্তব্য দেব। একটি ফাঁকা জায়গায় সব ইউনিট এসে সমবেত হলো। কথা বলার জন্য আমি তাদের মাঝখানে গিয়ে দাঁড়ালাম। পরিস্থিতি মোকাবিলায় যত্নবান হওয়া প্রয়োজন ছিল। আমাদের নতুন অবস্থান সম্পর্কে সমবেত সেনাদের সুকৌশলে বোঝানোর দরকার পড়ল। শুরু করলাম ইউনিটের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার প্রথম দিনগুলো, তৎকালীন পরিস্থিতি, পদমর্যাদা অনুযায়ী পরিস্থিতি মোকাবিলায় আমার অভিজ্ঞতার তৎকালীন ঘাটতি এবং সামলে নেওয়ার ঘটনাগুলোর কথা বলে। যুদ্ধক্ষেত্রের সবখানে আমরা যেসব বাধার মুখোমুখি হয়েছি, ঢাকার বাইরে ভারতীয় প্যারাট্রুপারদের অবতরণ, অন্যান্য এলাকায় সংঘবদ্ধ প্রতিরোধে ভাঙন প্রভৃতি বিষয়ে বললাম। অনিশ্চিত সামরিক পরিস্থিতি সম্পর্কে তাদের একটি ধারণা দিলাম। তারপর সময় এল আসল অবস্থা সম্পর্কে বলার, আমরা শিগগিরই যার মুখোমুখি হতে চলেছি। আমি বললাম, 'সামরিক অভিযান শুরু হওয়ার প্রথম দিন থেকেই আমি দুটি পছন্দের ওপর জোর দিয়েছি। দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে জীবন দিতে হবে অথবা বঙ্গোপসাগরে ভেসে যেতে হবে। তবে এখন তৃতীয় একটি পছন্দ আমাদের ওপর

চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে, আর তা হলো আত্মসমর্পণ করা। একজন যোদ্ধার জন্য এবং একজন মানুষের জন্য এটাই চূড়ান্ত লজ্জা।' এটা ছিল একটা বিধ্বস্ত অবস্থা-আত্মধ্বংসের মুহূর্ত।

কথা বলার সময় নিজের অশ্রু গোপন করার জন্য আমি দূর দিগন্তের দিকে তাকিয়ে ছিলাম। কিন্তু আমার গলার কাঁপন থামানোর উপায় ছিল না। আমার মনে হলো, একটি সুশৃঙ্খল বাহিনী হিসেবে আমাদের পরিচয় ধরে রাখার জন্য সবাইকে আমার সঙ্গে রাখতে হবে। আমাকে তাদের মুখোমুখি হতে হবে, যাতে আবেগের সংযোগ গড়ে ওঠে, পারস্পরিক আস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়। আমি তাদের দিকে তাকালাম প্রতিক্রিয়া যাচাই করার জন্য। তারা সবাই কার্যত নিচের দিকে তাকিয়ে ছিল। অসীম লজ্জা ও অপমান থেকে পালানোর জন্য তারা যেন মাটির গভীরে চলে যেতে চাইছে। অথবা হয়তো নিজেদের অধিনায়কের এমন ভেঙে পড়া অবস্থা না দেখার জন্য তারা ইচ্ছা করেই অমন করছিল। আমি এ কথা বলে দ্রুত বক্তব্য শেষ করলাম যে, যেহেতু জীবিত অথবা মৃত কোনো অবস্থাতেই নেপালে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে সফল হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই, অথবা খালি হাতে ভারতের বিরুদ্ধে লড়াই করেও ভালো কিছু পাওয়ার আশা নেই, পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ডের নির্দেশ পালন করাই এখন 'বিচক্ষণতা' হবে।

যারা মুক্তির জন্য চলে যেতে চায়, তাদের জন্যও দরজা খোলা রাখলাম। টাকাপয়সা দিয়ে সহায়তার প্রতিশ্রুতিও দেওয়া হলো। বেশ কয়েকজন পালিয়ে যাওয়ার অনুমতি চাইলে তাদের আবেদন মঞ্জুর করা হলো। তাদের কেউ কেউ প্রাণ হারাল। বাকিরা ইউনিটে ফিরে এল, কয়েকজন বুলেটের গুরুতর জখম নিয়ে।

আমাদের পেশাগত মৃত্যুর শেষ আনুষ্ঠানিকতাগুলো কয়েক দিন পর সম্পন্ন করা হলো। লজ্জাজনক কাজটি দলগত হওয়ায় আত্মসমর্পণের প্রভাব ছিল কিছুটা অনুভূতিশূন্য। কিন্তু মাথা হেঁট করে দেওয়া এই অসৈনিকোচিত পরিস্থিতির মুখোমুখি হওয়ার ব্যাপারটা ব্যক্তিগত পর্যায়ে ছিল অসম্ভব বিপর্যয়কর। দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে জীবন বিলিয়ে দিয়ে অমরত্ব অর্জন করার জন্য প্রকৃতি আমাদের একটি সুযোগ দিয়েছিল, অস্ত্র সমর্পণ করে নয়। কিন্তু আমরা গৌরব বরণ না করার পথ বেছে নিয়েছিলাম।

নিজেদের জন্য যে অবমাননা আমরা বেছে নিয়েছি, মন থেকে তা মেনে নেওয়ার চেষ্টায় চূড়ান্ত আনুষ্ঠানিকতা শুরুর আগে আমি বিশ্রামহীন রাত কাটালাম। সেদিন আমরা আমাদের অস্থায়ী নিবাস থেকে বেরিয়ে এলাম এবং মৃত্যুক্ষেত্রের দিকে এগিয়ে গেলাম। জায়গাটির নাম জাম জাম বিমানঘাঁটি, যুদ্ধের আগে সৈয়দপুরের সেনারা নিজেদের উদ্যোগে নির্মাণ করেছিল। সেটা ছিল এক দীর্ঘ যাত্রা। আমি নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছিলাম—প্রতিরক্ষাহীন ও অরক্ষিত; যেন একজন কয়েদি ফাঁসির মঞ্চের দিকে এগিয়ে চলেছে। প্রতিটি পদক্ষেপ তাকে জল্লাদের কাছাকাছি নিয়ে যাচ্ছে।

দুপুরের মধ্যেই আমরা সবাই জড়ো হলাম সেই বিমানক্ষেত্রে। ২৩ ব্রিগেডের কমান্ডের অধীনে কয়েক হাজার মানুষ, যারা ভিন্ন ভিন্ন আর্মস ও সার্ভিসের অধীন ছিল, তাদের মধ্যে ইপিসিএএফও ছিল। ২৬ এফএফ ছিল ওই সমাবেশের একটি অংশ। আমরা কাছাকাছি দলবদ্ধ হয়ে দাঁড়ালাম, প্রত্যেকে নিজের নিজের ভাবনায় তলিয়ে রইলাম।

ব্রিগেড কমান্ডার এসে হাজির। বিজয়ীরাও এল। তারপর যা ঘটল, তা এতটাই অমর্যাদাকর, যে কেউই মন থেকে মুছে ফেলতে চাইবে। কিন্তু সেই অসম্মানজনক স্মৃতি অবচেতন মন থেকে চিরতরে সরিয়ে ফেলা সম্ভব নয়। মাঝেমধ্যেই স্মৃতির সমুদ্র থেকে সেসব দৃশ্য ভেসে ওঠে।

আমার মনে আছে, সবাই অধিনায়কের নেতৃত্বে একটি নিয়মিত বিন্যাসে দাঁড়িয়েছিলাম। তিনি নিজের পিস্তল আনলোড করে সেটি ভারতীয় সেনাবাহিনীর প্রতিনিধির কাছে হস্তান্তর করলেন। সেটা ছিল এক বেদনাদায়ক দৃশ্য—একজন সেনানায়ক জীবনে বহু গৌরবময় পর্ব পেরিয়ে এসে জনসমক্ষে নিজের অহংকার ও স্বাধীনতা বিসর্জন দিচ্ছেন। আমি দেখতে পাচ্ছিলাম তাঁর ভেতরটা চৌচির হয়ে যাচ্ছে, যদিও তিনি নিজের আবেগ নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করছিলেন। তারপর সেনাদের অস্ত্র নামিয়ে রাখার নির্দেশ দেওয়ার পালা। ব্যাটালিয়ানের জ্যেষ্ঠ কমান্ডার হিসেবে এই অনিবার্য দায়িত্বটি আমার কাঁধেই এসে পড়ল।

আমি আকস্মিক নির্দেশ দিলাম, 'জমিন ফাং' (অস্ত্র নিচে রাখো)। প্রত্যেকে যার যার অস্ত্র নামিয়ে রাখল। এরপর কিছুক্ষণের নীরবতা। মনে হচ্ছিল পৃথিবীটা বুঝি থেমে গেছে। ভারতীয় প্রতিনিধি কী বক্তব্য দিয়েছিলেন, আমার মনে নেই। আমার মনে হয় না, তিনি সে রকম কিছু বলেছিলেন। এটা ছিল সীমিত সময়ের অনুষ্ঠান, সম্ভবত মাত্র কয়েক মিনিটের। কিন্তু মানসিকভাবে পরাজিতদের জন্য তা ছিল সহিষ্ণুতার এক অন্তহীন পরীক্ষা। মুক্ত জীবন থেকে দাসত্বের দিকে যাত্রা, যদিও তাতে মাত্র কয়েক সেকেন্ড লেগেছিল। কিন্তু সেটা ছিল কলঙ্কের এক অন্তহীন পথ।

যেভাবে আমরা নীরবে সমবেত হয়েছিলাম, সেভাবেই নিজেদের অবস্থানবিন্যাস ভাঙলাম। এই গভীর বেদনাদায়ক ঘটনাটির দৃশ্যমান প্রতিক্রিয়া ছিল ভিন্ন ভিন্ন। কেই প্রকাশ্যে কাঁদল। কেউ শূন্যতাভরা হাসির মধ্য দিয়ে নিজেদের অনুভূতি লুকানোর চেষ্টা করল এবং কারণ ছাড়াই যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার মতো বিষয় নিয়ে কথা বলতে লাগল। আর কেউ কেউ নিজেদের বর্তমান অবস্থা নিয়ে দুঃখ করল এবং এই অসম্মানজনক পরিস্থিতিতে পড়ার জন্য নিজেদের জ্যেষ্ঠদের দায়ী করতে লাগল। সবাই অপমানিত বোধ করছিল।

যেকোনো পরিস্থিতিতেই আত্মসমর্পণ একটা অসম্মানজনক ব্যাপার। আমাদের ক্ষেত্রে তা কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশে নাকি পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ডের স্থানীয় সিদ্ধান্তে ব্যাপারটা ঘটেছিল, তা বিবেচ্য নয়। সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও কোনো লড়াই ছেড়ে দেওয়া অপমানজনক। আমরা হয়তো এই নিন্দনীয় কাজটির পক্ষে এ সাফাই গাইতে পারি, ‘লড়াই করার মতো গুরুত্বপূর্ণ কারণ ছিল না’ বা ‘হাজারো জীবন রক্ষা পেয়েছে’ কিংবা ‘ওই যুদ্ধে সাফল্যময় উপসংহার টানা অসম্ভব ছিল’ ইত্যাদি বলে। কিন্তু এসব যুক্তি মোটেও জোরালো নয়। দৃশ্যত, সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীদের ইতিহাস-চেতনার ঘাটতি ছিল। আমরা যদি লড়াই করতে করতে মারা যেতাম, অথবা সব ধরনের প্রতিরোধের চেষ্টা করার পর বন্দী হতাম, জাতির মাথা উঁচুতে থাকত। পরবর্তী প্রজন্মের সামনে আমরা একটা অনুসরণীয় দৃষ্টান্ত রেখে যেতে পারতাম। হাই কমান্ড যদি বুঝতে পারত, এ ধরনের স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত পদক্ষেপ নেওয়ার পরিণাম গোটা জাতির মনোবলের ওপর কী রকম লজ্জাজনক আঘাত হানবে এবং আমাদের চিরশত্রুদের কী পরিমাণ নৈতিক প্রভুত্ব অর্জনের সুযোগ এনে দেবে, তা হলে নিশ্চিতভাবেই জাতীয় মর্যাদা রক্ষার স্বার্থে ‘কয়েক হাজার জীবন উৎসর্গ’ করার সিদ্ধান্ত নিত।

*হাকিম আরশাদ কোরেশীর দ্য ১৯৭১ ইন্দো-পাক ওয়ার: আ সোলজার্স নেরেটিভ বই থেকে আশিস আচার্যের অনুবাদ*

**হাকিম আরশাদ কোরেশী: ১৯৭১ সালে পাকিস্তান বাহিনীর ২৮ ফ্রন্টিয়ার্স ফোর্সের অধিনায়ক**

মুক্তিযুদ্ধ ই আর্কাইভ
liberationwarbangladesh.org